একক 1 ❑ 'রক্তকরবী'

1.1 গ্রন্থ-পরিচিতি
1.2 নাটকের পূর্বসূত্র
1.3 কথাবস্তু-সংশ্লেষ
1.4 'রক্তকরবী' নাটকের ভাবরূপ
1.4.1 যক্ষপুরীর শ্রেণীবিভাজিত পরিকাঠামো
1.5 প্রতীক-সংকেতের প্রয়োগ ও 'রক্তকরবী'
1.6 'রক্তকরবী'র গান
1.7 চরিত্র বিশ্লেষণ
1.7.1 নন্দিনী
1.7.2 রঞ্জন
1.7.3 মকররাজ
1.7.4 বিশুপাগল
1.7.5 কিশোর
1.7.6 অন্যান্য চরিত্র
1.8 অনুশীলনী
1.8.1 বিস্তৃত প্রশ্ন
1.8.2 অবিস্কৃত প্রশ্ন
1.8.3 সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন
1.9 গ্রন্থপঞ্জি

1.1 গ্রন্থ-পরিচিতি ঃ

'রক্তকরবী' নাটকের রচনাকাল ১৯২৩ খ্রিস্টাব্দ। ঐ বছরের মে থেকে অগাস্ট-সেপ্টেম্বরের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ এটি মোট দশবার লিখেছেন, প্রতিবারেই কিছু-না-কিছু সংযোজন এবং পরিবর্তন করেছিলেন তিনি। এরপরে 'প্রবাসী' পত্রিকার ১৩৩১ বাংলা সনের আভিসনব সংখ্যার এটি যখন প্রথম প্রকাশিত হয়, আরও কিছু পরিমার্জনা করেন রবীন্দ্রনাথ। এখন যে চেহারায় 'রক্তকরবী' নাটকে দেখা যায়, সেটি ঐ 'প্রবাসী'তে প্রকাশিত পাঠেরই অনুসারী। গ্রন্থাকারে বেরোয় ১৯২৬-এ।

এই নাটকের তিনবার নামকরণ করেন কবি : 'য(পুরী' (১ম-৩য় খসড়া); 'নন্দিনী' (৪র্থ-৭ম খসড়া) ও 'রক্ত করবী' (৮ম খসড়া থেকে)।

২য় খসড়া থেকে নায়িকার নাম প্রথমে সুনন্দা, তারপর নন্দিনী হয়েছে। ১ম খসড়ায় তার নাম ছিল খঞ্জন। তার গ্রামটি নিশানীপাড়া বলে উল্লেখিত হয়েছে ১ম-৪র্থ খসড়ায়(এরপর থেকে সেটি রূপান্তরিত হয়েছে ঈশানীপাড়া

বলে। প্রথম চারটি খসড়ায় গোকুল এবং চিকিৎসক— এ দুটি চরিত্র নেই। ৫ম পাঠে এই দুজনের এবং ৬ষ্ঠ পাঠে ছোট সর্দারের উপস্থিতি ঘটেছে সর্বপ্রথম। কিশোরকে দেখা যায় একেবারে ১০ম খসড়াতে। এইসব ছাড়াও, ১ম থেকে ১১শ— সবগুলি পাঠেই কিছু কিছু অদল-বদল হয়েছে সংলাপে, ভাষায় এবং বক্তব্যে।

নাটকটি পড়ার আগে এই ব্যাপারগুলির অন্তর্নিহিত কারণ যে কী, সে বিষয়ে ভাবনার অবকাশ আছে। এই নাটকের এতগুলি পাঠ রচনার উপল(হিসেবে একটা বিষয় খুব স্পষ্ট হয়ে ওঠে(রবীন্দ্রনাথ এর মাধ্যমে যা ব্যঞ্জিত বা ব্যস্ত করতে চেয়েছেন, সেটিকে যথাযথভাবে প্রকাশ করা গেল না—এমনটাই তিনি উপলব্ধি করেছিলেন বলে বারংবার এই নাটক নিয়ে ভাঙাগড়ার প্রয়াস পেয়েছিলেন তিনি। এই এতগুলি পাঠ বা খসড়া রচনা তারই ফলশ্রুতি।

1.2 নাটকের পূর্বসূত্র ঃ

'রক্ত(করবী' নাটকের পূর্বসূত্র স্বরূপ ইতিহাসের সর্বপ্রধান দুটি বিপ্-ব—ফরাসি বিপ্-ব (১৭৮৯) এবং রুশ বিপ্-ব (১৯১৭) — এ দুয়ের অল(প্রেরণা ছিল, এমন একটি তত্ত্ব সাম্প্রতিককালে উপস্থাপিত ও প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এই নাটকের অভ্যন্তরীণ কিছু কিছু উপপ(র অন্বিষ্ট বি(-ষণের সূত্রে এই কথা প্রমাণিত হয়েছে। রুশ বিপ্-বকে স্বাগত জানিয়ে রবীন্দ্রনাথ 'On the Cross-roads' নামে 'Modern Review' July, 1918) যে ইংরেজী প্রবন্ধটি লিখেছিলেন, তার সঙ্গে ভাবে, রূপে ও চিত্রকল্পে বহু জায়গায় সুনিশ্চিতভাবে অনুরূপক্ত এমন একটি কবিতাও তিনি লেখেন যার শিরোনাম 'বিজয়ী' ('প্রবাসী', মার্চ/এপ্রিল, ১৯১৮; চৈত্র ১৩২৪); পরে এটি 'পূরবী' কাব্যগ্রন্থে সংকলিত হয়। এই 'বিজয়ী কবিতার বিভিন্ন অংশের সঙ্গেও আবার 'রক্তকরবী'-র অন্তর্গত নানা বিষয়ের সাদৃশ্য এবং ভাবরূপের সাম্য দেখা যায়। ফলত, 'On the cross-roads' প্রবন্ধ, 'বিজয়ী' কবিতা এবং 'রক্তকরবী' নাটকের চূড়ান্ত পাঠটি মিলিয়ে পড়লে একই প্রেরমার নূসত্রে যে তারা রচিত হয়েছে, সেকথা নিঃসংশয়ে বোঝা যায়। 'রক্তকরবী' নাটকের সাম্প্রতিক একটি সংস্করণে (ন্যাশনাল বুক এজেন্সি থেকে প্রকাশিত) অধ্যাপক পল্লব সেনগুপ্ত এই বিষয়গুলি খুব বিস্তৃতভাবে বিশ্লেষণ এবং ব্যাখ্যা করে দেখিয়েছেন।

ফরাসি বিপ্লবকে মহিমান্বিত করে ১৯শ শতকের বিখ্যাত ফরাসি চিত্রশিল্পী ইউজিন দেলাক্রোয়া একটি ছবি আঁকেন ১৮৩০ সালে। 'রক্তকরবী' নাটকের শেষাংশের মধ্যে ঐ ছবির প্রেরণাগত অভিঘাতও দেখা যায় (এই নাটকের অচির-পূর্বে উল্লেখিত সংস্করণটি এই সূত্রেও দ্রষ্টব্য)।

সবটুকু মিলিয়ে, এই নাটকের পূর্বসূত্র হিসেবে ইতিহাসের যুগান্তকারী দুটি বিপ্লবের প্রেরণাকে কোনও ভাবেই অস্বীকার করা যায় না।

1.3 কথাবস্তু-সংশ্লেষ ঃ

'রক্তকরবী' নাটকের পটভূমি য(পুরী। খোদাইকর, করাতীদের য(পুরীতে নিয়ে আসা হয়। তারা কৃষিজীবন ছেড়ে য(পুরীর অন্ধকারে আসে। য(পুরীতে সোনার প্রলোভনে আসা সহজ কিন্তু সেখান থেকে ফিরে যাওয়ার পথ নেই। কারিগরেরা দিনরাত সোনার তাল খোঁড়ে। তাদের নিজস্ব সংস্কৃতিই শুদু বদলে দেওয়া হয় না, বদলে দেওয়া হয় তাদের ব্যক্তি(পরিচয়ও। সেখানে আচমকা এসে পড়ে নন্দিনী। নন্দিনীর প্রাণের আলো হঠাৎ করে য(পুরীর দাসত্ব স্বীকারে অভ্যস্ত মানুষগুলোকে নতুন করে ভাবতে শিখিয়েছে। নন্দিনীকে নিয়ম-নিষেধে বাঁধতে সর্দারেরাও পারে না। তাইতেই তারা নন্দিনীর মধ্যে সর্বনাশের ছায়া দেখতে শুরু করে। নন্দিনী শ্রেণী বিভাজনের ধনতান্ত্রিক নিয়ম-নিষেধ মানে না। সে অনায়াসে রাজার কাছেও পৌঁছে যায়। রাজাকে ডাক দেয় বাইরে আসার জন্যে। রাজাকে ফসল কাটার গান শোনায়। য(পুরীতে নন্দিনী খুঁজে পায় তার এক হারিয়ে যাওয়া সখা বিশু পাগলকে। বিশু তাকে গান শোনায়।

নন্দিনী তার সিঁথিতে, মণিবন্ধে রক্তকরবীর গয়না পরে। নন্দিনী যেমন রাজার কাছে, য(পুরীর সর্দার এবং অন্যান্যদের কাছে দুর্বোধ্য, রক্তকরবীর লাল রঙের তত্ত্বটিও তারা বুঝতে পারে না। নন্দিনী কাছে রক্তকরবীর একটাই ব্যাখ্যা—তার রঞ্জন এই ফুল ভালোবাসে। নন্দিনী য(পুরীর নিয়মের ভিত ক্রমাগতই টলিয়ে দেয় আর এই বিশ্বাস নিয়ে সে সকলকে খুশি বিলিয়ে বেড়ায় যে, রঞ্জন আসবে।

নন্দিনীর এই বিশ্বাস সর্দারদের বিস্মিত করে, বিশুকে খুশিতে ভরে দেয় আর রাজাকে ঈর্ষান্বিত করে। অবশেষে নীলকণ্ঠ পাখির পালক এসে পড়ে আর নন্দিনী সেদিন ঘোষণা করে, রঞ্জনের আসার লগ্ন এসে গেছে। সেই খুশির খবর সে বিলিয়ে দেয় য(পুরীতে।

রঞ্জন আসে। কিন্তু সে তো দাসত্বের কোনও শর্ত মানে না। তার উদ্ধত ভঙ্গি শাসনযন্ত্রের চালকদের ভয় পাইয়ে দেয়। সর্দারও রঞ্জনের চোখে দেখতে পায় শাসনযন্ত্রের আসন্ন পতন। অতএব সর্দার রাজাকেও ঠকায়। নন্দিনীর প্রতি রাজার অনুভূতি এবং দুর্বলতার কথা সর্দারের জানা ছিল বলে রঞ্জনের আসল পরিচয় রাজাকে জানায় না। রাজা রঞ্জনের মুখে নন্দিনীর নাম শুনতে পেয়ে সব সংযম হারিয়ে ফেলে। রঞ্জনাকে হত্যা করে রাজা। নন্দিনী রঞ্জনের মৃতদেহ দেখে। কিন্তু ব্যক্তি রঞ্জনের মৃত্যু নন্দিনীর পথ অন্ধকার করে দিতে পারে না। বরং রঞ্জনের দেখানো পথেই নন্দিনী তার সখিদের নিয়ে এগিয়ে যায়। নন্দিনীর এই জয়ে 'রক্তকরবী' নাটকের সমাপ্তি। যেখানে রাজা ও জালের আড়াল ভেঙে ফাগুলাল, বিশুদের সাথি হয়, তাদের সঙ্গে বন্দিদশা ভাঙতে চলে। সর্দাররা আটকাতে আসে বটে কিন্তু তারাও তো নন্দিনীকে অস্বীকার করতে পারে না। নন্দিনীর দেওয়া কুঁদফুলের মালা বর্শার আগায় দুলিয়েই তাদের য (পুরীর আগলবাঁধ অটুট রাখার ব্যর্থ চেষ্ট করতে হয়।

1.4 'রক্তকরবী' নাটকের ভাবরূপ ঃ

''এই নাটকটি সত্যমূলক।..... কবির জ্ঞানবিশ্বাসমতে এটি সম্পূর্ণ সত্য।''— 'রক্তকরবী' নাটকে নাট্যপরিচয় লিখতে গিয়ে এই স্বীকারোক্তি স্বয়ং নাট্যকারের। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর স্বভাবসিদ্ধ সরস ভঙ্গিতে এরপর নাট্যপরিচয়কে কিছুটা অন্যরকম করে তুলেছেন। একটা প্রশ্ন কিন্তু তারপরও থেকে যায়। 'সত্যমূলক' এবং সেটা 'কবির জ্ঞানবিশ্বাসমতে'— তাই-ই তো। ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থা, সেখানে বিপন্ন কৃষিজীবন, শ্রমিক শোষণ সেখানকার অর্থনীতির প্রথম এবং শেষ কথা— তেমন একটা ব্যবস্থা কী কবির কল্পনায়? সমকালীন ইউরোপে ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থা এবং তার চোখ ধাঁধানো ঐশ্বর্যের আড়ালে মানবতার চরম অবমাননা তাঁর চোখ এড়ায়নি। তাই য(পুরীর কথা লিখতে গিয়ে এগারো বার নাড়াচাড়া করতে হয়, কাঁটাছেড়া করতে হয় কাহিনী বিন্যাসকে। নাটকের নামকরণ নিয়েও এমনটা ঘটে। কবি 'য(পুরী' নাম নিয়ে— নিজেই উপলব্ধি করেন, নাটকের পটভূমি যক্ষপুরী হলেও য (পুরীর কথা বলা তো তাঁর উদ্দেশ্য নয়, যক্ষপুরীর ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার আড়াল থেকে নন্দিনী যে রাজাকে বার করে আনবে। একদিন যে রঞ্জন টলিয়ে দেবে মেজোসর্দারের ভন্ডামির ভিতকে। পাগলভাইয়ের গানে নন্দিনীর বিশ্বাসে, রঞ্জনের প্রাণস্রোতে সেদিক য (পুরীর মেকি ভদ্রতা আর লোভের শেকড়-বাকড় ছিঁড়ে যাবে। অতএব নাটকের নাম বদলে রাখলেন নন্দিনী। নন্দিনী তে শুধু একজন সাধারণ মানবী নয়, সে লালরঙের আভায় ভয় পাইয়ে দিতে পারে মোড়ল-সর্দারদের। নন্দিনীদের রঙ লাল— রক্তকরবীর আভরণে সে স্বপ্ন দেখে এবং দেখায়— একদিন তার রঞ্জন আসবে। এই যক্ষপুরীর সমস্ত অন্ধকার সেদিন ঝলমলিয়ে উঠবে সূর্যের আলোয়। অতএব 'নন্দিনী' নয়, 'রক্তকরবী'। নাটকের নাম হল 'রক্তকরবী'।

1.4.1 যক্ষপুরীর শ্রেণীবিভাজিত পরিকাঠামো

নন্দিনী য(পুরীতে আসার আগে য (পুরীর অবস্থা ঠিক কেমন ছিল সেকথা নাটকে নেই। কিন্তু সর্দারদের

এমনকী ফাগুলাল, গোকুল, চন্দ্রাদের কথায় তার আভাস মেলে। 'এই নাটব্যাপার যে নগরকে আশ্রয় করিয়া আছে তাহার নাম যক্ষপুরী'। যক্ষপুরীতে শ্রমিকদের কাজ একটাই—দিনরাত তারা মাটির অন্ধকার গহ্বর থেকে তাল তাল সোনা খুঁড়ে চলে। সর্দাররা তদারক করেন যাতে খোদাইকরদের কাজে একটুও ফাঁকি না পড়ে। শুধু কাজই নয়, খোদাইকরদের অবসরেও তাদের পূর্ণদৃষ্টি। সেই অবসরের ফাঁকে দেশের কথা, ফসল বোনার—ফসল কাটার কথা, নবান্নের কথা, একরাশ মুক্তির কথা যাতে মনে না পড়ে সেই দিকেও সর্দাররা সমান সতর্ক। গোঁসাইদের বহাল করে দেওয়া হয় কারিগরদের শান্তিমন্ত্র দেবার জন্য। সর্দারদের ওপরে মকররাজ। মকররাজ থাকেন একটা জালের আড়ালে। তাঁরসঙ্গে মানুষের যোগাযোগ প্রায় নেই বললেই চলে। খোদাইকররা এই যক্ষপুরীতে এসে সংখ্যায় পরিণত হয়েছে। তারা এখানে ৭১ ট, ৬৯ ঙ, ৪৭ ফ, ৬৫ ণ..... ইত্যাদি ইত্যাদি। জেলখানার কয়েদীদের মতন। অর্থাৎ এখানকার কারিগররা অন্যত্র কর্মরত শ্রমিক হিসেবে জীবনযাপন করে না, তারা বন্দি। চন্দ্রার মতো কারিগর এর স্ত্রীরা সর্দারদের খুশি করে স্বল্প দিনের ছুটি চায়। ছুটি কিন্তু যক্ষপুরীর নিয়মে নেই। অতএব—যা বলা গিয়েছিল, যক্ষপুরী কারিগরদের কাছে বন্দিশালা। সেইখানে একবার গেলে আর মুক্তি সহজে ঘটে না। সংখ্যাতত্ত্বের ছাপ মারা এইসব কারিগরদের দায়িত্বে আবার আছে মোড়লরা। তারাও কিন্তু সংখ্যাতত্ত্বের হিসেবের মধ্যেই। যেমন ট-ঠ পাড়ায় ৭১ ট মোড়ল। অতএব শ্রেণীগত অবস্থান অনুযায়ী মোড়লরাও কারিগরদের সঙ্গেই। মজার ব্যাপার সর্দারদের সঙ্গে একই শ্রেণীতে রয়েছে আরও এক পদাধিকারীরা। তাদের শ্রেণী প্রতিনিধি এখানে সেভাবে উপস্থিত নেই। একজন ছিল সে বিশু। তারা হল চর। যক্ষপুরীতে চরবৃত্তি এতটাই গুরুত্বপূর্ণ যে তারা সামাজিকতার খাতিরে সর্দারদের সঙ্গে ওঠাবসা করে। প্রমাণ বিশুর স্ত্রী। সর্দারনিদের তাসখেলার আসরে সে নিমন্ত্রণ পেত যতদিন বিশু চরগিরিতে আসীন ছিল। আসলে ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থায় চরবৃত্তি গুরুত্বপূর্ণ কেননা শ্রমিক বিদ্রোহকে সবচেয়ে বেশি ভয় করে তারা—যারা নিরন্তর শোষণ চালায়। তাই চরদের জন্য সুযোগ-সুবিধা ও আরামের ব্যবস্থা। তাদের কাজ—একটা সজীব দেহ, তার পিছনে পৃষ্ঠব্রণ হয়ে লেগে থাকা' (বিশুর কথায়) আর একজনের কথা বলা বাহুল্য। সে হল গোঁসাই। শ্রেণীগত অবস্থান তার সর্দারদের সঙ্গে নয় কিন্তু মকরবাজের নেতৃত্বে যারা শোষকের ভূমিকায়, তাদেরই সহচর গোঁসাই। অতএব গোঁসাইও এই ব্যবস্থারই একটা অঙ্গ। রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং নাট্যপরিচয়ে তার উল্লেখ করেছেন: "এ ছাড়া একজন গোঁসাইজি আছেন, তিনি নাম গ্রহণ করেন ভগবানের কিন্তু অন্ন গ্রহণ করেন সর্দারের। তাঁর দ্বারা যক্ষপুরীর অনেক উপকার ঘটে।"

যক্ষপুরীর এই শ্রেণী বিন্যাসের ছকটা এভাবে দেওয়া যেতে পারে।

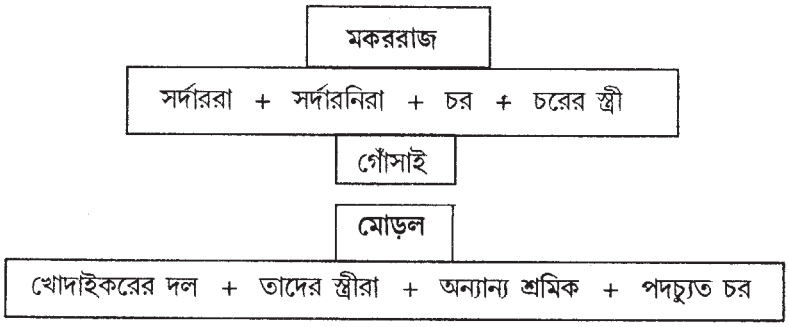

শ্রেণীবিন্যাসের এই ছকে মোড়লকে খোদাইকরদের শ্রেণীতে রেখেও যেমন আলাদা করে চিহ্নিত করা হয়েছে, সেভাবে সর্দারদের শ্রেণীতে গোঁসাইকে রেখেও আলাদা করে চিহ্নিত করে দেওয়া হয়েছে। একদিকে সর্দাররা গোঁসাইকে 'প্রভু, প্রণাম' বলে সম্মান জানায় আবার গোঁসাই 'অন্ন গ্রহণ করেন সর্দারের'। এছাড়াও গোঁসাই কোন্

পাড়ায় গিয়ে কাজ করবেন, তার সুস্পষ্ট নির্দেশ সর্দাররাই দেয়। অতএব শ্রেণীগত অবস্থানে গোঁসাই সর্দারদের সঙ্গে একই জায়গায় হলেও সম্মানে এক নয়। এই শ্রেণীসোপানের সর্বোচ্চে মকররাজ স্বয়ং। এই অবস্থানটা যদিও বিতর্কিত। যক্ষরাজ জালের আড়ালে থেকে বেরোন না। প্রত্যক্ষভাবে শাসনযন্ত্র কিন্তু সর্দারদেরই হাতে। অতএব এক অর্থে মকররাজ ক্ষমতার পুতুল। শ্রেণীবৈষম্যের এই ছক কিন্তু 'রক্তকরবী' নাটকে থেকেই রয়েছে। এবং নন্দিনী যে পরিকাঠামোকে ভেঙে দিয়ে তৃণমূল স্তর থেকে সর্বোচ্চস্তরে অনায়াসে পৌঁছে যেতে পারে। রঞ্জন যে বৈষম্যকে নস্যাৎ করে দিয়ে অট্টহাসি হাসতে পারে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কতটা সচেতনভাবে এই বৈষম্যের কথা বলেছেন, সে প্রশ্ন উঠতেই পারে। কিন্তু বলেছেন। এ প্রসঙ্গে অধ্যাপক পল্লব সেনগুপ্তের একটি মন্তব্য স্মরণ করা যেতে পারেঃ

> "শ্রেণীসংগ্রামের তত্ত্বে একজন মার্কসবাদী যেভাবে প্রত্যয়শীল—রবীন্দ্রনাথ সেভাবে ভাবতেন না যে, একথা বলাই বাহুল্য। কিন্তু এও তো আবার ঠিক যে, যে-বিশেষ আর্থ-সামাজিক পরিপ্রেক্ষিতে একটা সময়ে শ্রেণীসংঘাত অনিবার্য হয়ে ওঠে, সেটার স্বরূপ সম্পর্কেও তিনি অবহিত ছিলেন। রুশ বিপ্লব তাঁর অনুধ্যানকে এড়িয়ে যায়নি, বরং একটা উৎসুক আগ্রহই দেখিয়েছেন তিনি সে-বিষয়ে। জীবনের শেষ পর্বে এসে, চিরকালের ধনতন্ত্রবিমুখতার সঙ্গে তিনি শ্রমজীবী মানুষের অভ্যুদয় সম্পর্কেও আগ্রহী হয়েছিলেন। এমনকী, একটি কমিউনিস্ট তরুণকে মূল চরিত্র হিসেবে রেখে 'অমৃত' নামে কাহিনী-কবিতাও লিখেছিলেন রবীন্দ্রনাথ, যেটি সংকলিত আছে তাঁর 'শ্যামলী' কাব্যগ্রন্থে।"
>
> ('রক্তকরবী'; মুখবন্ধ; এন.বি.এ. সংস্করণ, ২০০১)

ধনতান্ত্রিক এই কাঠামো তার নিজের স্বভাবেই স্পষ্ট হয় তারপর একদিন 'নিজের অন্তর্বিলীন স্ববিরোধিতার জন্য দীর্ণ হয়ে যায়'। তাই 'রক্তকরবী' নাটকে যক্ষপুরীর রাজা একদিন শ্রমিকদের সঙ্গে বেরিয়ে আসে পথে। নন্দিনীর হাতে হাত দিয়ে। শ্রমিকদের সঙ্গে রাজাও সামিল হয় রাজারই বন্দিশালা ভাঙতে।

"আজ আমাকে তোমার সাথি করো নন্দিন"।

১.৫ প্রতীক-সংকেতের প্রয়োগ ও 'রক্তকরবী' ঃ

মকররাজ স্বয়ং এখানে ধনতন্ত্রের প্রতীক। সঙ্গে রয়েছে সর্দারেরা। রাজা বাইরে আসেন না। শুধু তাই নয়, তিনি জালের মধ্যেও কাউকে আহ্বান করেন না। এই জালটা এই ব্যবস্থার পক্ষে খুবই জরুরি। নন্দিনীকে আটকানোর ক্ষমতা যদিও সেই জালের নেই। নন্দিনী জালের ভেতরে গিয়ে দেখেছে। তার স্বীকারোক্তি 'এই জালের বাইরে থেকে ভয় করে। কিন্তু আমি যে ভিতরে গিয়ে দেখেছি।' এইজন্যেই জালের আড়ালটা খুব জরুরি। মানুষের মনে ক্ষমতার কেন্দ্রবিন্দু সম্পর্কে এই ভয়টা জাগিয়ে রাখার স্বার্থেই রাজা জালের আড়ালে থাকেন। জালটা অতএব ক্ষমতারই প্রতীক। নন্দিনী যক্ষপুরীর অন্ধকারে মূর্তিমতী বেনিয়ম। তাই ক্ষমতার প্রবল প্রকাশকে সে ভয় করে না। তার গহনা রক্তকরবীর। রক্তকরবীর লাল একদিকে যেমন বিদ্রোহের প্রতীক, অন্যদিকে যৌবনের প্রতীক। তার লাল রঙের ফুল নিয়ে তাই সকলের বিস্ময়। রাজা বিস্মিত, অধ্যাপক বিস্মিত। নন্দিনী কিন্তু সেই ফুল শুধুমাত্র রঞ্জনের জন্যেই রাখে। খুশি হয়ে সে অধ্যাপককে মালা দেয়, রাজাকেও দেয়; কিন্তু সে কুঁদফুলের মালা। নন্দিনী যক্ষপুরীর অন্ধকারে একরাশ আলোর মতো হুড়মুড়িয়ে ঢুকে পড়েছে। ধনতন্ত্রের ভিত নাড়িয়ে দিতে পারে যে মেয়ে তার কাছে লাল রঙ অন্য মাত্রা পায়। নন্দিনী হাতে রক্তকরবীর কঙ্কন পরে, সিঁথিতে ঝোলায় রক্তকরবী, গলায় পরে রক্তকরবীর মালা। শুধু তাই নয়, তার অন্তরের সমস্ত কথা বলা হয়ে যায় এই রক্তকরবীর মধ্যে দিয়ে। নন্দিনী কিশোরকে বলেছে '....তাকে এই রক্তকরবীর গুচ্ছ দিলেই আমার সব কথা জানানো হবে।" লালফুল চিরকালই নারী ও যৌবনের প্রতীক হিসেবে গণ্য। নন্দিনী প্রেমিকা এবং একই সঙ্গে গণ অভ্যুত্থানের নায়িকা। এই দুটো সত্তাই রক্তকরবীর লাল রঙে

আভাসিত। মকররাজকে সে টলিয়ে দিতে পেরেছিল। কিশোরের সব কাজ সব অবকাশ ভরে উঠত নন্দিনীকে রক্তকরবী এনে দিতে পারার ভাললাগায়। বিশুপাগলের গানে সুর লাগত নন্দিনীর এই রক্তরাগের ছোঁয়ায়। অধ্যাপক খুঁজে বেড়াতেন লাল রঙের তত্ত্বটি। আর সর্দাররা দেখতে পেত সর্বনাশের ছায়া। নীলকণ্ঠ পাখির পালকও এখানে আলাদা তাৎপর্যমণ্ডিত। একটা নিশ্চিত প্রত্যয় যেমন প্রতীকায়িত তেমনি অসীমের সংবাদ বয়ে আনে নীলকণ্ঠ পাখির পালক। নীলকণ্ঠ পাখির অনুষঙ্গ সাহিত্যে বারেবারেই অসীমের খবর বয়ে আনার প্রতীক হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে এবং শুভ সংবাদ। রূপকথার গল্পে নীলকণ্ঠ পাখির কথা আছে। যে পাখি পথ বলে দেয় রাজপুত্রকে, নন্দিনী এমনিতেই প্রত্যয়ী। নীলকণ্ঠ পাখির পালকে সে রঞ্জনের আসার খবর পায়। শুধু আভাসটুকুই নয়, সে নিশ্চিত, বিশুকে নন্দিনী বলে "মনের মধ্যে খবর এসে পৌঁছেছে, আজ নিশ্চয় রঞ্জন আসবে..... আমার জানলার সামনে ডালিমের ডালে রোজ নীলকণ্ঠপাখি এসে বসে। আমি সন্ধে হলেই ধ্রুবতারাকে প্রণাম করে বলি, ওর ডানার একটি পালক আমার ঘরে এসে যদি উড়ে পড়ে তো জানব আমার রঞ্জন আসবে। আজ সকালে জেগে উঠেই দেখি, উত্তরে হাওয়ায় পালক আমার বিছানায় এসে পড়ে আছে। এই দেখো আমার বুকের আঁচলে।"

নীলকণ্ঠ পাখি জয়যাত্রারও প্রতীক। বিশুর সংলাপে সেকথা উঠে এসেছে "লোকে বলে, নীলকণ্ঠের পাখায় জয়যাত্রার শুভচিহ্ন আছে।" ধাণী রঙে আছে ফসলের আভাস। ধাণী রঙ ফসলের প্রতীক। যক্ষপুরীতে যেখানে অন্ধকারের গহ্বর থেকে সোনা খুঁড়ে আনাই একমাত্র নেশা, সেখানে বন্ধ্যাত্বের আভাস সূচিত। মানুষের মনকেও সেখানে সৃষ্টির অবসর দেওয়া হয়না। নন্দিনীর ধাণী রঙের শাড়ি এই বন্ধ্যাত্বের প্রতিস্পর্ধী।

রাজার হাতে তিন হাজার বছর টিকে থাকা একটা মরা ব্যাঙ দেখেছিল নন্দিনী। লোকবিশ্বাসে ব্যাঙ যৌনতার প্রতীক, স্থবিরতারও বটে। তার কাছ থেকে মকররাজ শিখতে চেয়েছিলেন কেমন করে টিকে থাকতে হয়। আসলে এখানে টিকে থাকাটাও প্রতীকী। রাজাও কী আদৌ বেঁচে ছিলেন? যার জীবনে বিশ্রামের আরাম নেই, সৃষ্টির ইঙ্গিত নেই, তারও তো জীবন মানে শুধুই টিকে থাকা, মহাস্থবির ব্যাঙের মত। তবুও মকররাজ বুঝতে পারলেন যে, ব্যাঙটা শুধু টিকে থাকতেই শিখেছে, বাঁচতে শেখেনি, মরে গেছে সে। যেভাবে টিকে থাকতে অভ্যস্ত ধনতান্ত্রিক নিয়ম নিষেধের জালের আড়ালে ক্লান্ত রাজাও একদিন মরার আরাম পাবেন, মুক্তির খুশি তার প্রাণে লাগবে, তারও ইঙ্গিত এখানে সূচিত।

এভাবে সমগ্র নাটকে প্রতীকী ব্যাঞ্জনা রয়েছে। লোকায়ত বিশ্বাসের যে প্রতীক, নাট্যকার তাকেও যেমন গ্রহণ করেছেন, তেমনি তার প্রয়োগের ক্ষেত্রে অনেকসময় ভিন্ন মতাবলম্বীও হয়েছেন। রবীন্দ্রসাহিত্যে প্রতীকের ব্যবহার এবং সাংকেতিকতার একটা আলাদা তাৎপর্য রয়েছে। সাহিত্য শিল্পে ভাব সাধারণত ভাষার মধ্যে আত্মপ্রকাশ করে। সুক্ষ্ম ও অনির্দিষ্ট শুধুমাত্র অনুভবগম্য যে ভাব ভাষায় প্রকাশ করা যায় না, তারজন্য সংকেত ও প্রতীকের আশ্রয় নিতে হয় কবিকে। রবীন্দ্রনাথের সাংকেতিক ও প্রতীকী নাটকগুলিও সেভাবেই সৃষ্ট।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের রূপক-সাংকেতিক ও প্রতীকী নাটকগুলো মোটামুটিভাবে বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী তিনটি পর্বে ভাগ করা যায়।

প্রথম পর্বে — প্রকৃতির প্রতিশোধ

দ্বিতীয় পর্বে — শারদোৎসব, অচলায়তন, রাজা ও ডাকঘর

তৃতীয় পর্বে — ফাল্গুনী, মুক্তধারা, রক্তকরবী, কালের যাত্রা এবং তাসের দেশ।

১৮৮৪ তে 'প্রকৃতির প্রতিশোধ' লেখা, কবির বয়স তখন তেইশ। লেখার মধ্যে অপরিণতির ছাপ তখনও রয়েছে। ১৯৮০ এ শারদোৎসব থেকে শুরু করে তাঁর নাটকে প্রতীকের ব্যবহার একটা অন্যমাত্রা পেয়েছে। 'মুক্তধারা' ও

'রক্তকরবী' তে সব্যতার সঙ্কট চিত্রিত হয়েছে প্রতীকের ব্যবহারে। 'মুক্তধারা'য় দেখা গেল সাম্রাজ্যবাদ ও যন্ত্রবিদ্যা হাত মিলিয়ে মানুষের তুষার জল রোধ করতে যায়। তখন ঝরণার তলা থেকে কুড়িয়ে পাওয়া রাজকুমার অভিজিৎ প্রাণ দিয়ে যন্ত্রের বাধা ভেঙে দেয়। প্রমাণ করে দেয়—যন্ত্র নয়, মানুষই বড়। 'রক্ত(করবী' নাটকটি সেভাবেই আধুনিক সামাজিক, রাষ্ট্রিক, মানসিক অশান্তি ও সংকটের পটভূমিকায় পরিকল্পিত হয়েছে। 'রাজা' নাটক সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ মন্তব্য করেছিলেন "The Human sol has its inner drama." আসলে তাঁর সব প্রতীক নাটকগুলো সম্পর্কেই একথা প্রযোজ্য। রক্তকরবী নাটকেও প্রতীক ব্যবহারের মধ্যে দিয়ে 'inner drama of the human soul' কেই ফুটিয়ে তুলেছেন। ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থায় শ্রমিক শোষণ এবং শেষে অবশ্যম্ভাবী অন্তর্ঘাতের মধ্যে দিয়ে ধনতন্ত্রের পতনকে প্রতীক ব্যবহারের মাধ্যমে ফুটিয়ে তুলেছেন।

1.6 রক্তকরবীর গান ঃ

'রক্তকরবী' নাটকের গানগুলির বিশেষ ধরনের কিছু তাৎপর্য রয়েছে। নাটকের প্রথম গানটি হল পৌষের উৎসবের গান—ফসলকাটার গান, "পৌষ তোদের ডাক দিয়েছে, আয় রে চলে আয় আয় আয়—"(এই পৌষের গান নন্দিনী রাজাকেও শোনাতে চেয়েছে। য(পুরীর মকররাজ, যাঁর সঙ্গে ফসল ফলানোর কোনো যোগ নেই, সৃষ্টির যোগ নেই, শুধু মাটির তলার মরা। ধন খুঁড়ে খুঁড়ে ঐ(শ্বর্যের পাহাড় বানায় আর মানুষের প্রাণশক্তি(কে শোষণ করে। সেই রাজাকে ফসলের গান শোনায় নন্দিনী। গানের মাঝেই রাজাকে ডাক দেয় "তুমিও বেরিয়ে এসো রাজা, তোমাকে মাঠে নিয়ে যাই।" ফসল ফলানো, ফসল কাটা, যেখানে সহজ সৃষ্টির আভাস আছে, মকররাজের কাছে সেই সহজের ডাক দুর্বোধ্য ঠেকে। নন্দিনীর মধ্যে যে খুশির প্রাচুর্য, যা রাজাকে একই সঙ্গে মুগ্ধ ও বিস্মিত করে, সেই খুশি আসলে এই প্রকৃতির খুশি। য(পুরীর অন্ধকারে যে খুশি পথ খুঁজে পায় না। নন্দিনী সেই খুশির সন্ধান দিতে চায় রাজাকে ".....আলোতে বেরিয়ে এসো, মাটির উপর পা দাও, পৃথিবী খুশি হয়ে উঠুক। আলোর খুশি উঠল জেগে/ধানের শিষে শিশির লেগে,/ধরার খুশি ধরে না গো, ওই যে উথলে, ...'রক্ত(করবী' নাটকের গান আসলে নন্দিনীর পাগলভাইয়ের গান। য(পুরী তাদের দুঃখের জায়গা। নন্দিনীর আনন্দের সাথি রঞ্জন আর তার মানবিক দুঃখ-বেদনার সন্ধান সে আগে কখনও পায়নি। বিশুর নিবেদন যে ঠিক্ কোনখানে, য(পুরীর সকলেই তা বুঝতে পারে। তাই বিশু যখন গান গায়, 'মোর স্বপন-তরীর কে তুই নেয়ে।' তখন চন্দ্রা বলে ওঠে "তোমার স্বপন-তরীর নেয়েটি কে, সে আমি জানি" আসলে বিশু পাগল যেমন নন্দিনীকে দুঃখের সন্ধান দেয়, সেই দুঃখ তো তার মনের মধ্যে প্রতি মুহূর্তে নতুন করে বাজে। য(পুরীতে তার জীবিকা ছিল চরের। তার বিবেকের নির্দেশে সেই কাজ থেকে অব্যাহতি নিয়ে কারিগরদের ভূমিকায় বিশু আসীন। মনুষ্যত্বের লাঞ্ছনা দেখতে দেখতে প্রত্যেক মুহূর্তেই সে মরমে মরে যায়। য(পুরীতে এসে তাদের আকাশ হারিয়ে গেছে, অবকাশ হারিয়ে গেছে। মানুষকে তার বোধ(বিবেক, বুদ্ধি, অবকাশ সবশুদ্ধ কিনে নেওয়া য(পুরীর নিয়ম। সেই নিয়মে পাগল ভাইয়ের মন ছটফটিয়ে ওঠে মুক্তি(র জন্য। সেকথা বিশুর গানের মধ্যে প্রতিফলিত।

"তোর সূর্য ছিল গহন মেঘের মাঝে,
তোর দিন মরেছে অকাজেরই কাজে।
তবে আসুক-না সেই তিমিররাতি,
লুপ্তিনেশার চরম সাথি,
তোর ক্লান্ত আঁখি দিক সে ঢাকি দিক-ভোলাবার ঘোরে।"

নন্দিনী আসলে বিশুপাগলার 'দুখজাগানিয়া'। তাই বিশু তার 'সমুদ্রের আগম পারের দূতী'কে গান শোনায়। আসলে নন্দিনী আর বিসু য(পুরীর নিয়মের দুই মূর্তিমান ব্যতিক্রম। য(পুরীর অন্ধকার মানুষের হৃদয়কেও অন্ধকারে ভরিয়ে দেয়। নন্দিনীর সেটা উপলব্ধি করতে পারে। তার পাগল ভাইকে সেকথা বলে, ''পাগল ভাই, এই বন্ধ গড়ের ভিতরে কেবল তোমার আমার মাঝখানটাতেই একখানা আকাশ বেঁচে আছে। বাকি আর-সব বোজা।'' বিশু ও সেকথা বোঝে। বোঝে বলেই তো নন্দিনী তার 'দুখজাগানিয়া'। ''সেই আকাশটা আছে বলেই তোমাকে গান শোনাতে পারি।''—এই কথার সূত্র ধরেই এই গানটি আসে ''তোমায় গান শোনাব তাই তো আমায় জাগিয়ে রাখ/ওগো ঘুম ভাঙানিয়া'' গান তুমি গাও আগে আমি তার খবর পাইনি।'' নন্দিনী-রঞ্জনের প্রাণের জোয়ারে ভেসে যাওয়ার যে খেলা, সেখানে একদিন বিশুও ছিল সাথের সাথি। তাপর সে চলে গেছে একলা বেরিয়ে। এই নি(দ্দেশে ভেসে যাওয়ার খবর নন্দিনী জানতে চায় বিশুপাগলের কাছে। বিশু সেই উত্তর দেয় গানে গানে ''আমার তরী ছিল চেনার কূলে,/বাঁধন তাহার গেল খুলে,/তারে হাওয়ায় হাওয়ায় নিয়ে গেল/কোন্ অচেনার ধারে।''

রক্তকরবী নাটকের গানে একাধিকবার চাঁদের প্রসঙ্গ এসেছে। 'চোখের জলের লাগল জোয়ার' গানটিতে চাঁদের পরিক্রমণের কথাই মূলত উঠে এসেছে। চাঁদকে সম্বোধন করেই এ গানের শুরু। 'যুগে যুগে বুঝি আমায় চেয়েছিল সে' গানটিতেও চাঁদের প্রসঙ্গ এসেছে। আসলে য(পুরীর অন্ধকারের সঙ্গে সাযুজ্য রেখে যেমন চাঁদের কথা উঠে আসে তেমনি চাঁদের পরিক্রমণ শেষে নতুন দিনের ইঙ্গতও আছে। নন্দিনীর মুখচন্দ্রও হয়ত বা তাঁর পাগলভাইকে মনে পড়িয়ে দেয় আকাশের চাঁদের কথা। যে আকাসে একাকার হয়ে গেছে চন্দ্রমুখী নন্দিনী, তার ধ্রুবতারা রঞ্জন আর তার পাগলভাই।

''আজ ওই চাঁদের বরণ হবে আলোর সংগীতে
রাতের মুখে আঁধারখানি খুলবে ইঙ্গিতে।
শুক্ল রাতে সেই আলোকে
দেখা হবে, এক পলকে
সব আবরণ যাবে যে খসে।''

'রক্তকরবী' নাটকের শেষে বিশুর গলায় যে গান সোনা যায়, তা ফসলের গান। সে জয়ধ্বনি দেয় 'নন্দিনীর জয়' নন্দিনীর জয় মানেই রঞ্জনের জয় তথা মুক্তির জয়। য(পুরীর বন্ধ দশা ঘুচিয়ে দেবার যে স্বপ্ন, সেই স্বপ্নের জয়।

এই নাটকে নন্দিনীর কণ্ঠে আরও একটা গান শোনা গেছে। সেই গান নন্দিনী রাজাকে শুনিয়েছে। নন্দিনীকে সে গান শিখিয়েছে তার পাগলভাই। সেই গানে আছে আকাশের কথা, জল-স্থলের কথা, ছুটির কথা, মুক্তি(র কথা। সেই যে নন্দিনী বিশুকে বলেছিল, য(পুরীতে আকাশ লুপ্ত হয়ে গেছে, শুধু তার আর পাগলভাইয়ের মনে আকাশ বেঁচে আছে, সেই আকাশেই মুক্তি(র খবর আসে, ভালবাসার খবর আসে, বেদনারও খবর আসে।

''ভালোবাসি ভালোবাসি
এই সুরে কাছে দূরে জলে স্থলে বাজায় বাঁশি।
আকাশে কার বুকের মাঝে
ব্যাথা বাজে
দিগন্তে কার কালো আঁখির জলে যায় গো ভাসি।''

এই মুক্তি(র গানে যে বেদনার সুর বেজেছে, সেই সার রাজাকে ভয় পাইয়ে দিয়েছে। বুকের মধ্যে হৃদয় নামক বস্তুটিকে সযত্নে খিল এঁটে রেখে দিয়ে মানুষ মারার কল চালায় যে রাজা, সুরের ছোঁয়াচ বাঁচিয়ে তাকে থাকতেই হবে। বুকের

লৌহ কপাট খুলে গেলে দেবতা বেরিয়ে এসে রাজশাসনের বিপদ ঘটাতে পারে। নন্দিনী জানে রাজা গানকে ভয় পায় ''পাগল ভাই, ঐ-যে মরা ব্যাঙটা ফেলে রেখে দিয়ে কখন পালিয়েছে। গান শুনতে ও ভায় পায়''

রবীন্দ্রনাথের গালেনই আছে, ''গানে গানে সব বন্ধন থাক টুটে''। তাঁর সমস্ত নাটকেই গান প্রতিবাদে অস্ত্র হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। নাটকের মূল বক্তব্য কখনও গানেই উঠে আসে। 'মুক্তধারা', 'রথের রশি' ইত্যাদি সমস্ত নাটকেই গান একটি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ। আসলে সুরের যে আবেদন, তার কাছেই পরাজিত হতে পারে মানুষের অন্যায়। পৃথিবীর সব বিদ্রোহ-বিপ্লবে গান মানুষকে লড়াইয়ের শক্তি জুগিয়েছে। মৃত্যুর মধ্যে থেকে ফিরে আসা যায় সুরের হাত ধরে ''তোমার কাছে এ বর মাগিয়মরণ হতে যেন জাগি গানের সুরে।'' সেভাবেই 'রক্তকরবী' নাটকের গান প্রতিবাদের গান। কৃষিসভ্যাতর জয়গানও বটে। আবার ব্যথিত মানুষের পারস্পরিক সমবেদনারও গান।

1.7 চরিত্র-বিশ্লেষণ ঃ

1.7.1 নন্দিনী ঃ

''নারীর ভিতর দিয়ে বিচিত্র রসময় প্রাণের প্রবর্তনা যদি পুরুষের উদ্যমের মধ্যে সঞ্চারিত হবার বাধা পায়, তা হলেই তার সৃষ্টিতে যন্ত্রের প্রাধান্য ঘটে। তখন মানুষ আপনার সৃষ্ট যনেত্রর আঘাতে কেবলই পীড়া দেয়, পীড়িত হয়।

এই ভাবটা আমার রক্তকরবী নাটকের মধ্যে প্রকাশ পেয়েছে। য (পুরে পুরুষের প্রবল শক্তি মাটির তলা থেকে সোনার সম্পদ ছিন্ন করে আনছে। নিষ্ঠুর সংগ্রহের লুব্ধ চেষ্টায় তাড়নায় প্রাণের মাধুর্য সেখান থেকে নির্বাসিত সেখানে জটিলতার জালে আপনাকে আপনি জড়িত করে মানুষ বিশ্ব থেকে বিচ্ছিন্ন। তাই সে ভুলেছে, সোনার চেয়ে আনন্দের দাম বেশি; ভুলেছে, প্রতাপের মধ্যে পূর্ণতা নেই, প্রেমের মধ্যেই পূর্ণতা। সেখানে মানুষকে দাস করে রাখবার প্রকাণ্ড আয়োজনে মানুষ নিজেকেই নিজে বন্দি করেছে।

এমন সময়ে সেখানে নারী এল, নন্দিনী এল; প্রাণের বেগ এসে পড়ল যন্ত্রের উপরষ প্রেমের আবেগ আঘাত করতে লাগল লুব্ধ দুশ্চেষ্টার বন্ধনজালকে। তখন সেই নারীশক্তির নিগুঢ় প্রবর্তনায় কী করে পুরুষ নিজের রচিত কারাগরকে ভেঙে ফেলে প্রামের প্রবাহকে বাধামুক্ত করবার চেষ্টায় প্রবৃত্ত হল, এই নাটকে তাই বর্ণিত আছে।'' যাত্রী গ্রন্থে পশ্চিমী যাত্রীর ডায়ারি অংশে 'রক্তকরবী' সম্পর্কে এই উক্তি স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের। নারী শক্তির প্রাবল্যে য(পুরীর কারগার ভেঙে গেছে। ভেঙে গেছে রাজার জালের আড়াল। নন্দিনী সেই নারীশক্তির প্রতীক। য(পুরীর অন্ধকারে সে হঠাৎ এসে পড়েছে একরাশ আলোর মতো। সোনরা তাল খোঁড়ে যে কারিগরেরা, পুঁরি মধ্যে তত্ত্বের অনুসন্ধানে ক্লান্ত যে অধ্যাপক, মানুষের মনুষ্যত্বকে অবদমিত, অবলুপ্ত করার তদারকতিে ব্যস্ত যে সর্দারোর, ক্ষমতা আর ঐশ্বর্যের চুড়োয় বসে যে রাজা, তাদের সকলেরই চোখ ধাঁধিয়ে গেছে রক্তকরবীর আভায়। নন্দিনীর রক্তকরবীর আভরণ দুহাত বাড়িয়ে আকর্ষণ করে অধ্যাপককে। আকর্ষণ করে রাজাকেও। অধ্যাপক কিশোর, পাগলভাইদের মতই সেই আকর্ষণকে সহজ বলে স্বীকার করে নেয়। রাজা পারে না। অথচ নন্দিনীর অনিবার্য আকর্ষণকে এড়িয়ে যাবার সাধ্যও রাজার নেই।

নন্দিনী অধ্যাপকের তত্ত্বভিড়করা মগজের মধ্যে একটা দুর্বোধ্য ভাবনা জাগিয়ে তোলে। অধ্যাপক বুঝতে পারে না সেই অচেনা অনুভূতিকে। তার তত্ত্ব কথায় সেই বিস্ময়ের আভাস মেলে। ''সকালে ফুলের বনে যে আলো আসে তাতে বিস্ময় নেই, কিন্তু পাকা দেয়ালের ফাটল দিয়ে যে আলো আসে সে আর এক কথা। য(পুরে তুমি সেই আচমকা আলো।.....'' নন্দিনী যে আলোর খবর বয়ে নিয়ে এনেছে যক্ষপুরে, সেই আলোর নিশানা চিনে রঞ্জনও আসবে, নন্দিনী অধ্যাপককে সে কথা জানায়। নন্দিনী আসলে য (পুরীর মৃত আত্মাকে দেখতে পায়। সেই মৃতপ্রায়

ব্যবস্থার গায়ে যৌবনের পরশমনি স্পর্শ করিয়ে তাকে উজ্জীবিত করতে চায়। তার বিশ্বাস অটল। অদ্যাপককে তাই বলে, ''আমার রঞ্জনকে এখানে আনলে এদের মরা পাঁজরের ভিতর প্রাণ নেচে উঠবে।'' নন্দিনীর বিশ্বাসের কাছে, তার প্রাণশক্তির কাছে অধ্যাপকের মনও ভিক্ষুকের মতই প্রার্থনা করে, নন্দিনীর ডান হাতে রক্তকরবীর কঙ্কন থেকে খসানো একটা পুল। নন্দিনীকে বুঝতে পারে না অধ্যাপক। বুঝতে পারে না তার রক্তকরবীররঙে তত্ত্ব। রাজার কাছেও নন্দিনী অগাধ বিস্ময়। তাকে আর পাঁচজন মানুষের মতো ভয় দেখাতেও ব্যর্থ হয় মকররাজ। রাজার ক্ষমতা আছে। সেই ক্ষমতাবলে সে নারীকে অনায়াসে সেবাদাসী করে রাখতে পারে, নন্দিনী কিন্তু নির্ভয়। রাজার ক্ষমতা তার কাছে তুচ্ছ হয়ে যায়। নন্দিনীর যৌবন, তার পূর্ণতা, তার রক্তকরবীর ঐ(র্য সব কিছুর সামনেই মকররাজের নিজেকে অকিঞ্চিতকর বলে মনে হয়। নন্দিনী আসলে কৃষিসভ্যতার উর্বরতাকে বয়ে এনেছে। যক্ষপুরীর বন্ধ্যাত্বর মধ্যে তাই সে পদে পদে অসঙ্গতি দেখতে পায়। ধনতন্ত্রের এই মেকি ক্ষমতার বিন্যাসের মধ্যেই যে অন্তর্ঘাত এবং অবশ্যম্ভাবী ধ্বংসের বীজ লুকিয়ে আছে, তা সে রাজাকে দেখিয়ে দিতে চায়। ''দেখছ না?—এখানে সবাই যেন কেমন রেগে আছে, কিম্বা সন্দেহ করছে, কিম্বা ভয় পাচ্ছে।'' নন্দিনী রাজাকে শোনায় ফসল কাটার গান। নন্দিনী উচ্ছল, প্রাণপ্রাচুর্যে ভরপুর সে, তবুও তার মধ্যে একটা আশ্রয় রয়েছে। যে আশ্রয় রাজাকে লোভ দেখায় বিশ্রামের। রঞ্জন যে খুশি বয়ে নিয়ে বেড়ায় সেই খুশির রসদ যে নন্দিনীই জোগায়, সেটা উপলব্ধি করতে পেরেই রাজা রঞ্জনকে ঈর্ষা করতে শুরু করে। নন্দিনীকে ছিনিয়ে আনা যায় না, তাকে সেবাদাসী করে রাখার সামর্থ রাজার নেই, সেই অক্ষমতায় পুড়তে থাকে রাজা। আর নন্দিনীর পাগল ভাই তাকে গান শুনিয়েই তৃপ্ত। নন্দিনী শুধু বিশুর কাছেই ব্যক্ত করে নিজেকে। রাজা রঞ্জনকে প্রতিস্পর্ধী ভাবে। নন্দিনী কিন্তু বিশুকেই একমাত্র স্বীকার করে নেয় রঞ্জনের দোসর হিসেবে। বিশু তাকে গান শোনায়। সেই গানের মধ্যে দিয়ে নন্দিনী যেমন মুক্তির স্বাদ পায়, তেমনি দুঃখেরও স্বাদ পায়। নন্দিনী বিশুকে বলে, ''তোমাকে একটা কথা বলি পাগল! যে দুঃখটির গান তুমি গাও আগে আমি তার খবর পাইনি।'' রঞ্জনের কাছে সে যৌবনের সবটুকু আনন্দ পেয়েছে, কিন্তু নন্দিনীকে দুঃখের স্বাদ শুধু তার পাগলভাইই দিতে পারে। নন্দিনীর মনের মধ্যে আলো-ছায়ার মতো পাশাপাশি এবং অনিবার্য রঞ্জন আর বিশুর অস্তিত্ব। নন্দিনী আলোর শিখার মতো তার যাওয়ার পথের সব অন্ধকারকে আলোয় ভরিয়ে দিয়ে যাওয়া তার ধর্ম। সেভাবেই সে রাজার মিথ্যের অন্ধকারকে, অধ্যাপকের তত্ত্বের জমাট অন্ধকারকে আলোয় ভরে দিয়ে যায়। আলোর মধ্যেই তার অস্তিত্বের কণা কণা রেখে যায় নন্দিনী। কিন্তু সেই অলোকে উজ্জ্বলতর, অনির্বাণ করে তোলে রঞ্জন, বিশু। এই তুলনা এবং প্রতিতুলনা শোনা যায় নন্দিনীর নিজের কণ্ঠেই।

''দুই হাতে দুই দাঁড় ধরে সে আমাকে তুফানের নদী পার করে দেয়(বুনো ঘোড়ার কেশর ধরে আমাকে বনের ভিতর দিয়ে ছুটিয়ে নিয়ে যায়(লাফ-দেওয়া বাঘের দুই ভুরুর মাঝখানে তীর মেরে সে আমার ভয়কে উড়িয়ে দিয়ে হা হা করে হাসে। আমাদের নাগাই নদীতে ঝাঁপিয়ে পড়ে স্রোতটাকে যেমন সে তোলপাড় করে, আমাকে নিয়ে তেমনি সে তোলপাড় করতে থাকে। প্রাণ নিয়ে সর্বস্ব পণ করে সে হার-জিতের খেলা খেলে। সেই খেলাতেই আমাকে জিতে নিয়েছে। একদিন তুমিও তো তার মধ্যে ছিল, কিন্তু কী মনে করে বাজি খেলার ভিড় থেকে একলা বেরিয়ে গেলে। যাবার সময় কেমন করে আমার মুখের দিকে তাকালে বুঝতে পারলুম না—তার পরে কতকাল খোঁজ পাইনি। কোথায় তুমি গেলে বলো তো।''

নন্দিনীর সঙ্গে তার পাগলভাইয়ের পরিচয় য(পুরীতে এসেই নয়। নন্দিনীর সাথি যেমন রঞ্জন, তেমনিই বিশু। নন্দিনী যেদিন রঞ্জনের আসবার খবর পেয়েছিল নীলকণ্ঠ পাখির পালকে, সেই খবর বিশুকে দিয়েছে। সেদিন থেকেই নন্দিনীর সঙ্গে বিশুর আপেক্ষার শুরু। রঞ্জন আসবে। নন্দিনীর মধ্যে যে রক্তকরবীর আভা, তাতে গোকুল, চন্দ্রারা দেখেছিল সর্বনাশের মশাল, মকররাজ দেখতে পেয়েছিল তার শনিগ্রহ আর অধ্যাপক শুনতে পেয়েছিল

বিপ্লবের দূরাগত পদধ্বনি নন্দিনী বিশ্বাস সত্যে পরিণত হয়েছে। তার রঞ্জন যক্ষপুরীতে নন্দিনীর মধ্যে যে রাঙা আলোর মশাল রয়েছেন সেই মশাল একদিন যক্ষপুরীতে সত্যিই আলোয় ভরে দিয়েছে। নন্দিনী বুঝতে পেরেছে লগ্ন ঘনিয়ে এসেছে। বন্দিশালার দরজা ভাঙার, রাজাকে জালের আড়ালে থেকে বার করে আনার, রঞ্জনের সঙ্গে তার মিলনের। রঞ্জনের ভালোবাসার রঙ লাল। তার ভালোবাসায় ফুল রক্তকরবী। সেকারণেই নন্দিনী রক্তকরবীর গয়না পরে। রঞ্জনকে পাওয়ার খুশিতে হয়ত কখনও কখনও প্রার্থীর বাড়িয়ে দেওয়া হাতে একটা-আধটা রক্তকরবী উপহারও দেয়। যদিও সে নিজে থেকে সর্দার, রাজা সকলকেই শুভ্র কুঁদফুলের মালাই উপাহর দেয়। আর রক্ত করবীর ফুল উপহার নেয় তার প্রাণের আর এক সখা কিশোরের কাছ থেকে। যে কিশোর নন্দিনীর কাছে নিজেকে নিবেদন করতে পারলেই ধন্য হয়ে যায়। 'শ্যামা' নৃত্যনাট্যের উত্তীয় যেমন শ্যামার কাছে নিজেকে সমর্পন করার জন্য মৃত্যুকে বরণ করে নিয়েছিল, কিশোরও নন্দিনীর তেমন সখা। তার হাত থেকে রক্তকরবীর ফুল নেয় নন্দিনী। অবশেষে রঞ্জনের সঙ্গে তার মিলনের পরম লগ্ন যখন ঘনিয়ে আসে, নন্দিনী দেখতে পায়, তার রক্ত করবীর লাল আভা যক্ষপুরীর আকাশে বাতাসে ছড়িয়ে পড়েছে। ''দেখতে দেখতে সিঁদুরে মেঘে আজকের গোধূলি রাঙা হয়ে উঠল। ঐ কি আমাদের মিলনের রঙ। আমার সিঁথের সিঁদুর যেন সমস্ত আকাশে ছড়িয়ে গেছে।'' নন্দিনীর সঙ্গে রঞ্জনের যে সম্পর্ক ব্যক্তিমৃত্যু তার ওপর ছায়া ফেলতে পারে না। নন্দিনী রঞ্জন আসার খুশিতে তাই অকৃপণ হাতে কুঁদফুল, রক্তকরবী উপহার দিয়েছিল। রঞ্জন আসবে খবর পেয়েই সে ঘোষণা করেছিল, সময় হয়ে গেছে। ক্ষেত্র প্রস্তুত সে করে ফেলেছিল। নাটকের শেষ দৃশ্যে তাই দেখা যায় নন্দিনী মকররাজের জালের আড়াল ভেঙেছে। য (পুরীর রাস্তায় একই সঙ্গে রাজা এসে দাঁড়িয়েছে ফাগুলাল, বিশু তথা বন্দিশালার অন্যান্য কারিগরদের মধ্যে। রঞ্জনকে তার আগেই রাজা হত্যা করেছে। নন্দিনীকে যে রাজা ভালবেসেছিল, সেই ভালবাসা সঞ্জাত ঈর্ষাই প্রণোদিত করেছিল রঞ্জনকে হত্যা করতে। রঞ্জনের মুখে নন্দিনীর নাম শুনে রাজা 'সইতে' পারেনি। তার 'নাড়ীতে নাড়ীতে যেন আগুন জ্বলে উঠল'। নন্দিনী চোখের সামনে রঞ্জনের মৃতদেহ দেখেছে। তার বিশ্বাস থেকে নন্দিনী কিন্তু সরে আসেনি। সে জানে, রঞ্জনকে মেরে ফেলা যায় না। তাই তার প্রথম প্রতিক্রিয়া— ''বীর আমার, নীলকণ্ঠ পাখির পালক এই পরিয়ে দিলুম তোমার চূড়ায়। তোমার জয়যাত্রা আজ হতে শুরু হয়েছে। সেই যাত্রার বাহন আমি— ''এরপরই নন্দিনী শেষ যুদ্ধের ডাক দিয়েছে। রাজা সেখানে নন্দিনীর সাথি। ফাগুলাল বিসমিমত হয়ে নন্দিনীকে প্রশ্ন করেছেষ নন্দিনী বিশ্বাসঘাতকতা করছে কিনা জানতে চেয়েছে ফাগুলাল। আসলে ফাগুলাল গোকুল বাচন্দ্রার ক্ষুদ্র সংসারবুধিতে নন্দিনীর পরিমাপ করা যাচ্ছিল না। সে কারণেই তার দিকে সন্দেহের আঙুল । যে মকররাজের রাজতন্ত্র তথা ধনতন্ত্রের বিরুধ্ধে তাজের লড়াই, সেই লড়াইয়ে কেমন করে রাজাকেও সঙ্গী করে নেওয়া যায়, নন্দিনী কোন্ মন্ত্রবলে রাজাকে পথে টেনে নামায় তাই বুঝতে পারেনি ফাগুলাল। নন্দিনী ফাগুলালকে বুঝিয়েছে, রঞ্জনের পথ ধরে মৃত্যুর পথে তারা সকলে সাথি হবে। মৃত্যুর পথ ধরেই মৃত্যুত্তীর্ণ হবার সাধনা তাদের। ফাগুলাল নন্দিনীর সঙ্গে রঞ্জনের এই বিচ্ছেদকে সাধারণ মানুষের মতই মানবিক দৃষ্টিতে দেখে। রঞ্জনের রক্তাক্ত ধুলিলুণ্ঠিত দেহ চোখের সামনে দেখে তাই সে হাহাকার করে ওঠে ''হায়রে নন্দিনী, সুন্দরী আমার। এইজন্যই কি তুমি এতদিন অপেক্ষ করে ছিলে আমাদের এই অন্ধ নরকে।'' নন্দিনীর অপেক্ষা আসলে তো শুধুই ব্যক্তিরঞ্জনের জন্যে নয়। নন্দিনী আসলে রঞ্জনের হাত ধরে একটা শ্রেণী শোষণমুক্ত সমাজের স্বপ্ন দেখে। সেই স্বপ্ন সঞ্চারিত হয়ে যায় এক থেকে বহুতে। তাই রঞ্জন থেকে যায়, নন্দিনীও বেঁচে থাকে স্বপ্নের মধ্যে। নন্দিনীর বিশ্বাস তাই কখনও ভেঙে যায় না। ''মৃত্যুর মধ্যে তার অপরাজিত কণ্ঠস্বর আমি যে এই শুনতে পাচ্ছি। রঞ্জন বেঁচে উঠবে—ও কখনো মরতে পারে না।'' আসলে বিপ্লব দীর্ঘ-দীর্ঘ- দীর্ঘজীবন লাভ করে। মানুষকে লড়াইয়ে প্রণোদিত করে। অন্ধকারের পথ বেয়ে রঞ্জনরা আসে, নন্দিনীদের সঙ্গে নিয়ে আলোর সন্ধানে পাড়ি দেয়। নন্দিনী সেকথা বোঝে। তাই তার সখা, তার প্রিয় মানুষ তার অপেক্ষাকে নিঃসাড়ে পথের ধুলোয় পড়ে থাকতে দেখেও তার হাহাকার নেই। বরং একটা সুদৃঢ় প্রত্যয় খেলা করে নন্দিনীর কণ্ঠে ''ও

আসবে বলে অপেক্ষা করে ছিলুম, ও তো এল। ও আবার আসার জন্যে প্রস্তুত হবে, ও আবার আসবে।"

নন্দিনী আসলে বিপ্লবের দূত। অক্ষয়যৌবন নিয়ে সে ব্যর্থ প্রাণের সব আবর্জনা উড়িয়ে নিয়ে যেতে পারে। একই সঙ্গে জীবনের সন্ধান দেয় সে মৃত্যুকে উপেক্ষা করে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রায় সমসাময়িক কাব্যগ্রন্থ 'মহুয়া'র 'সবলা' কবিতায় যেভাবে নারীর কণ্ঠে উচ্চারিত হয়েছে 'বীর হস্তে বরমাল্য লব একদিন', তেমনি করেই রঞ্জনদের কাছ থেকে বরমাল্য নেবার জন্য নন্দিনীরা অনেক-অনেক কাল অপেক্ষা করে থাকে আর রঞ্জনরা নন্দিনীদের দেওয়া মিলনের 'রক্তরাখী' হাতে বেঁধে চলে যায় আবার আসবে বলে।

১.৭.২ রঞ্জন

রঞ্জন রক্তকরবী নাটকে অনুপস্থিত। যক্ষপুরী এই নাটকের পটভূমি। যক্ষপুরীতে রঞ্জন এসে পৌঁছেছে নাটকের শেষ দৃশ্যে। কিন্তু রঞ্জন ছিল। রঞ্জন ছিল নন্দিনীর মধ্যে, বিশুপাগলার উচ্চারণে, রাজার ঈর্ষায়, অধ্যাপকের বিস্ময়ে ছড়িয়ে ছিটিয়ে। 'রক্তকরবী' নাটকে যক্ষপুরীর রাজা মকররাজ। নাটকের নায়ক হওয়ার দাবি তারই। কিন্তু মকররাজের চেতনা জাগিয়ে দিয়েছে রঞ্জন। নন্দিনীর চোখে, নন্দিনীর স্বপ্নে রঞ্জনের ধ্রুবতারার মতো উপস্থিতি রাজাকে আত্মদর্শনে সাহায্য করেছে। রঞ্জনের যৌবনের দাবি, সুন্দরের দাবি, প্রাণপ্রাচুর্যের দাবি, এই সবের কাছে রাজা যে তুচ্ছ হয়ে যায়, সেই উপলব্ধি রাজাকে ক্রমাগত ভেঙেছে, বিক্ষত করেছে। রঞ্জন নন্দিনীকে বিপ্লবের মন্ত্র দিয়েছিল। নন্দিনী যক্ষপুরীর ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার পরিকাঠামোকে নাড়িয়ে দিয়েছিল শুধু এই বিশ্বাস নিয়ে যে, রঞ্জন আসবে। নন্দিনীকে রাজা শক্তি আর ঐশ্বর্যের ভয় দেখায় নন্দিনী রঞ্জন সম্পর্কে রাজাকেও সাবধান করে দেয় "আমার রঞ্জন এখানে যদি থাকত, তোমার মুখের উপর তুড়ি মেরে সে মরত, তবু ভয় পেত না।"

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'মুক্তধারা' নাটকের অভিজিৎ যন্ত্রের বাধা ভেঙে দিয়ে মানুষের কাছে সৃষ্টির সহজ দানকে পৌঁছে দিয়েছিল। নিজে সে ভেসে গিয়েছিল সেই জলের তোড়ে। সেভাবেই ব্যক্তি রঞ্জনকে হয়ত মকররাজ হত্যা করতে পারে কিন্তু রঞ্জন আবার আসে, বারবার সে ঘুরেফিরে আসে শোষণযন্ত্রকে ভেঙে গুড়িয়ে দেবে বলে।

১.৭.৩ মকররাজ ঃ

যক্ষপুরীর রাজার নাম মকররাজ। তিনি জালের আড়ালে থাকেন। যক্ষপুরীতে যে সুস্পষ্ট সিঁড়ি রয়েছে, তার সর্বোচ্চ ধাপে মকররাজের অবস্থান অথচ তিনিও বন্দি। যক্ষপুরীর নিয়মের বাইরে একপাও হাঁটতে পারেন না রাজা। নন্দিনী এসে জালের দরজায় ঘা দেয়। নন্দিনী প্রাণের খুশি নিয়ে রাজার কাছে যেতে চায়। রাজা প্রাণপণে নিজেকে আড়াল করে রাখে আর তাতেই নন্দিনীর কাছে রাজার দুর্বলতা ধরা পড়ে যায়। নন্দিনীর কাছে নিজের দুর্বলতা যাতে প্রকাশ না পায় তাই নিজেকে আরও বেশি করে ঘোষণা করে রাজা। প্রত্যাখান করে নন্দিনীর কুন্দফুলের মালা। "আমি পর্বতের চূড়ার মতো, শূন্যতাই আমার শোভা।" নন্দিনীর প্রাণ-প্রাচুর্য রাজাকে অবাক করে, ভেতরে ভেতরে পরাজিত হতে হতে জিতে যেতে চায় রাজা "আমার শক্তিতে তুমি খুশি হও নন্দিনী?" রাজার ক্ষমতা আছে, আছে সুপ্রচুর ঐশ্বর্য। যক্ষপুরীতে যে ক্ষমতার বিন্যাস, তাতে রাজা ক্ষমতা বলে যেমন করে পৃথিবীর বুক চিরে তার ঐশ্বর্য ছিনিয়ে আনে, মানবীও তেমন করে ছিনিয়ে আনবারই। অন্তত পৃথিবীর উঁচু লোকেদের তেমনই দাবি। হৃদয় দিয়ে হৃদয়কে জয় করে নেওয়ার কথা রাজা বোঝে না। নন্দিনীকে মুঠোয় ভরতে না পেরে রাজা তাই ছটফটিয়ে ওঠে একটা অনভ্যস্ত পরাজয়ের অনুভূতিতে। "নন্দিনী, তুমি কী জান?—বিধাতা তোমাকেও রূপের মায়ার আড়ালে অপরূপ করে রেখেছেন। তার মধ্যে থেকে ছিনিয়ে তোমাকে আমার মুঠোর ভিতর পেতে চাচ্ছি, কিছুতেই ধরতে পারছিনে। আমি তোমাকে উল্‌টিয়ে পাল্‌টিয়ে দেখতে চাই, না পারি তো ভেঙেচুরে ফেলতে চাই।" রাজা মানবীকে ভোগ্য হিসেবে দেখতেই অভ্যস্ত। নারী তার কাছে সহজলভ্য। নন্দিনীও খুব সাধারণ, কোমল একটা মেয়ে অথচ

তার কাঠিন্যে রাজাকে পরাজিত করে দেয় প্রতি পলে। রাজার কাছে নন্দিনী এলে রাজা তাকে অত্যন্ত রূক্ষস্বরে ব্যস্ততার কথা শোনায়, ফিরে যেতে আদেশ দেয়। অথচ নন্দিনী যখন বিদায় নিতে চায়, রাজা তখন বিরহী প্রেমিকের মতো অস্থির হয়ে ওঠে। রঞ্জনকে দেখে নন্দিনীর হৃদয়ে যে ছন্দ জাগে, রাজাকে দেখেও তেমন হয় কিনা রাজা জানতে চায়। য(পুরীর বিপুল ঐশ্বর্যের অধিপতি নিজেকে তুলনা করে রঞ্জনের সঙ্গে। নন্দিনীকে অধিকার কের নেবার দাবি জানিয়ে, তাকে শক্তির পরী(ায় জিতে নেবর কথা বলতে বলতে রাজা কখন যেন রঞ্জনের, বিশুর, কিশোরের সমতলে নেমে আসে। মকররাজ ভুলে যায়, সে য(পুরীর সর্বোচ্চ ক্ষমতাধর মানুষ আর নন্দিনী খোদাইকরদের শ্রেণীর। নন্দিনীর কাছে রাজা জানতে চায়, ''.....বলো আমাকে তোমার ভালো লাগে কি না। ....রঞ্জনের মতোই?'' নন্দিনী বুঝতে পেরেছিল, য (পুরীর সকলে রাজাকে ভয় করে, তাকে দূর থেকে ক্ষমতার কেন্দ্র হিসেবে দেখে বলেই। রাজা যে জালের আড়ালে নিজেকে লুকিয়ে রাখতে চায়, সে শুধুই দুর্বলতাকে গোপন করার চেষ্টা, নন্দিনীর কাছে তা খুব সহজেই ধরা পড়ে গিয়েছিল, ফাঁপিয়ে ফুলিয়ে তোলা বুদ্‌বুদের মতো একদিন সে সব যে শূন্যে মিলিয়ে যেতে পারে, সেদিন যে সব ফাঁকি ধরা পড়ে যাবে, নন্দিনী রাজাকে তার ইঙ্গিতও দিয়েছে। রাজা কিন্তু নন্দিনীর কাছে একদিন নিজেকে মেলে ধরেছে। যক্ষপুরীর মকররাজ যে আসলে নিজেই জালের আড়ালে বন্দি, সেটা স্পষ্ট হয়ে যায় রাজার স্বীকারোক্তিতে। তার যৌবন বিগত আর সেখানেই তার পরাজয় রঞ্জনদের কাছে। নন্দিনী, রঞ্জনরা 'নতুন যৌবনেরই দূত'। রাজা সেখানে বেমানান। এত ঐশ্বর্য, এত ক্ষমতা, সবটাই যে আসলে একটা ফাঁকি, সেটা স্পষ্ট হয়ে ওঠে রাজার কথায়। ''আমি প্রকাণ্ড মরুভূমি—তোমার মতো একটি ছোট্ট ঘাসের দিকে হাত বাড়িয়ে বলছি—আমি তপ্ত, আমি রিক্ত, আমি ক্লান্ত। তৃষ্ণার দাহে এই মরুটা কত উর্বরা ভূমিকে লেহন করে নিয়েছে, তাতে মরুর পরিসরই বাড়ছে, ঐ একটুখানি দুর্বল ঘাসের মধ্যে যে প্রাণ আছে তাকে আপন করতে পারছে না।'' রাজা একদিন নন্দিনীকে বলেছিল যে, শূন্যতাই তার শোভা। রাজার মধ্যেকার শূন্যতা শক্তির ভারে, ঐশ্বর্যের ভারে কবেলই বেড়ে উঠেছে। রাজার মনে হয়েছে শূন্যতা রাজার শোভা কিন্তু আসলে রাজা ক্রমাগতই সেই বিশ্বাস থেকে সরে এসে নতুন করে বিশ্বাস করতে শুরু করেছে, পূর্ণতার ভিক্ষুক সে। যে হাত দাবি করে, ছিনিয়ে আনে কেবলই, সেই হাতে প্রার্থীরমতো অঞ্জলি পেতে সামনে দাঁড়িয়েছে নন্দিনীর। নন্দিনীর মধ্যে রাজা খুঁজে পেয়েছে ছন্দ। রাজার হিসেবী মন নেচে উঠেছে সেই ছন্দে। ''বিশ্বের বাঁশিতে নাচের যে ছন্দ বাজে সেই ছন্দ'' নন্দিনীর মধ্যে। রাজা সেই ছন্দের কাছে নিজের সব বোঝা অর্পন করে মুক্ত হতে চায়। আর সেটা পারে না বলেই নন্দিনীর রক্তকরবীর আভা ছেঁকে নিয়ে ছিঁড়ে নিয়ে দুচোখে পরতে চায়। রঞ্জনের জন্যে নন্দিনীর অপেক্ষাকে, তার পূর্ণ নিবেদনকে বিশু শ্রদ্ধা করে, পূর্ণতার কামনা করে কিন্তু রাজা পারে না। রাজা কেবলই রঞ্জনের সঙ্গে প্রতিতুলনায় নিজেকে প্রমাণ করবার চেষ্টা করে। মনে মনে পরাজিত হয়ে যায় বলেই ঈর্ষায় অধীর হয়ে যায়। ''সেই ছন্দে বস্তুর বিপুল ভার হালকা হয়ে যায়। সেই ছন্দে গ্রহ নক্ষত্রের দল ভিখারি নটবালকের মতো আকাশে আকাশে নেচে বেড়াচ্ছে। সেই নাচের ছন্দেই, নন্দিনী, তুমি এমন সহজ হয়েছ, এমন সুন্দর। আমার তুলনায় তুমি কতটুকু, তবু তোমাকে ঈর্ষা করি।''

রাজা জানে, যে হাত দিয়ে সে শোষণের আর শাসনের চাবুক তুলে এনেছে, যে হাত দিয়ে পৃথিবীর সম্পদ জোর করে হরণ করে এনেছে, সেই হাত দিয়ে বিধাতার সহজ দানের মুঠি সে কখনও খুলতে পারবে না। রাজার মধ্যে পরাজয় আর জয়ের আকাঙ্খা প্রতিমূহূর্তে ক্রিয়াশীল হয়। অবশেষে রাজাকে পরাজিত হতে হবে, বঞ্চিত হতে হতে বিশ্বাস করতে শুরু করে, একদিন ক্ষমতার মিথ্যে বুদ্‌বুদ্‌ ভেঙে যাবে। রাজা বুঝতে পারে, খণ্ড খণ্ড চাওয়া আর দস্যুবৃত্তির জন্যই তার মধ্যে কিছু না পাওয়ার যন্ত্রণা। রাজার সেই চাওয়ার দস্যু হার মেনে নেয় নন্দিনীর কাছে।

''তোমার রঞ্জন যে ছুটি বয়ে নিয়ে বেড়ায় সেই ছুটিকে রক্তকরবীর মধু দিয়ে ভরে রাখে কে, আমি কী জানি নে? নন্দিনী, তুমি তো আমাকে ফাকা ছুটির খবর দিলে, মধু কোথায় পাব?''

ধনতন্ত্র বিকশিত হতে হতে ধ্বংসের পথে এগিয়ে যায়, 'নিজের অন্তর্বিলীন স্ববিরোধিতার জন্য'। রাজা যক্ষপুরীর ধনতান্ত্রিক কাঠামোর সর্বোচ্চে সে কিন্তু এই প্রথম নন্দিনীর কাছে নিজের পরাজয় স্বীকার করে নেই। 'সুন্দরের জবাব সুন্দরই পায়' অর্থাৎ নন্দিনীকে রঞ্জনই ভরিয়ে রাখতে পারে অথবা নন্দিনী রঞ্জনকে। একথা বলার মধ্যে দিয়ে রাজার হার মানতে শেখার শুরু। পরাজয় স্বীকার করার স্বস্তি যেমন রাজার কণ্ঠ জুড়ে তেমনি প্রাথমিক পরাজয়ের সূত্র ধরে ধনতন্ত্রের চূড়ান্ত পরাজয় যে অবশ্যম্ভাবী, রাজা তাও বুঝতে পারে। যে জালের আড়ালে নিজেকে ভয়ানক করে রেখেছিল মকররাজ, নন্দিনীর কাছে সেই ফাঁকি ধরা পড়ে গেছে। ধরা পড়ে যাবে সকলের কাছেই আর তখনই শ্রেণী বৈষম্যের সুযোগে গড়ে তোলা শাসনযন্ত্র ভেঙে যাবে—সেকথা রাজা উপলব্ধি করতে শুরু করেছে। নন্দিনীর রক্তকরবীর আভায় তাই রাজা ধ্বংসের আভাস খুঁজে পায় "ঐ ফুলের গুচ্ছ দেখি আর মনে হয়, ঐ যেন আমারই রক্ত আলোর শনিগ্রহ ফুলের রূপ ধরে এসেছে। কখনো ইচ্ছে করছে তোমার কাছ থেকে কেড়ে নিয়ে ছিঁড়ে ফেলি;" রাজা কেড়ে নিতে পারে। তার হাতে শক্তি আছে, রয়েছে রাজতন্ত্রের মারণশক্তিও। সেই শক্তি বলে রঞ্জনকে রাজা হত্যা করতে পারে। নন্দিনী যে বিপ্লবের ডাক দেয়, রঞ্জন যে বিপ্লবের বার্তা নিয়ে যক্ষপুরীতে আসে, মকররাজের মিথ্যে ভয় দেখানোকে সেই বিপ্লবের গান নিস্ক্রিয় করে দেয়। রাজা নন্দিনীকে ভয় দেখালে নন্দিনী তাই রাজাকে গাঁয়ের শ্রীকণ্ঠের মতো মনে হয়। শ্রীকণ্ঠ যাত্রায় রাক্ষস সাজে। সেই সাজে ছেলের দল ভয় পায় তার রাক্ষসরূপী শ্রীকণ্ঠ তাতে ভারি খুশি হয়। রাজাকেও রাক্ষসরূপী শ্রীকণ্ঠের মতই মনে হয় নন্দিনীর। জালের আড়ালে, ক্ষমতার দর্প—সবটাই যাত্রার সাজের মতই। সেই সাজ খুলে ফেললেই রক্ত-মাংসের মানুষটি তার ক্লান্তি, রিক্ততা নিয়ে সকলের মাঝখানে এসে দাঁড়াতে পারে। রাজার ভয় দেখানোর খেলাকে তুড়ি মেরে উড়িয়ে দিয়ে নন্দিনী তাই প্রশ্ন করে "এই জুজুর পুতুল সেজে থাকতে লজ্জা করে না!"

একদিন মকররাজ পাথরের আড়ালে আটকে থাকা তিন হাজার বছরের একটা মরা ব্যাঙের থেকে শিখতে চাইছিল কি করে টিকে থাকতে হয়। এই যক্ষপুরীতে ক্ষমতার কেন্দ্রবিন্দুতে টিকে থাকা , মানুষকে সংখ্যায় পরিণত করে, তাদের আকাশ—তাদের আনন্দ-উৎসবকে নিশ্চিহ্ন করে দিয়ে তাদের প্রাণশক্তি শুষে নিয়ে তাদের দিয়ে সোনার তাল খোঁড়ানো, প্রতিবাদী মানুষের কণ্ঠ রোধ করা—এই ছিল মকররাজের দিনযাপনের নিয়ম। নন্দিনী প্রথম রাজাকে বুঝিয়ে দেয়, রাজার সব অক্ষমতা তার কাছে ধরা পড়ে গেছে। রাজার ক্ষমতার প্রদর্শনকে তাদের গাঁয়ের শ্রীকণ্ঠের যাত্রায় রাক্ষস সাজার মতই মিথ্যে সাজ বলে নন্দিনীর মনে হয়। রাজা নিজের ক্লান্তির কথা, রিক্ততার কথা আস্তে আস্তে নন্দিনীর কাছে ব্যক্ত করতে শুরু করে। সেই সঙ্গে সঙ্গে মকররাজেরও আত্মপোলব্ধি শুরু হয়। নন্দিনীর স্বচ্ছ হৃদয়ে নিজের সত্যকার ছবি প্রতিফলিত হতে দেখে মকররাজ বুঝতে পারেন, তিনি মানুষকে ক্রমাগত বঞ্চিত করতে গিয়ে নিজেকেই বঞ্চিত করেছেন। এতটাই রিক্ত, এতটাই অকিঞ্চিতকর হয়ে গেছে যে নন্দিনীকে পাবার জন্য আকুল হলেও নিজে যে আসলে সে অসুন্দরের প্রতিমূর্তি, সেকথাইবারবার মনের মধ্যে ঘুরে ফিরে আসে। রাজা নন্দিনীকে বলে, "সামনে তোমার মুখে চোখে প্রাণের লীলা, আর পিছনে তোমার কালো চুলের ধারা মৃত্যুর নিস্তব্ধ ঝর্ণা। আমার এই হাতদুটো সেদিন তার মধ্যে ডুব দিয়ে মরবার আরাম পেয়েছিল। মরণের মাধুর্য আর কখনো এমন করে ভাবিনি।" যে রাজা তিন হাজার বছরের মরে যাওয়া ব্যাঙের কাছ থেকে টিকে থাকার রহস্য উদ্ধারের চেষ্টা করছিল, সেই রাজা 'মরবার আরাম' যখন খুঁজে পায়, তখনই নন্দিনীর জিতে যাওয়ার শুরু। রঞ্জন আসার আগেই নন্দিনী যক্ষপুরীতে রঞ্জনের বার্তা নিয়ে এসেছিল। সে এসেছিল ক্ষেত্র প্রস্তুত করতে। রাজা স্বয়ং নন্দিনীর প্রধান সহচর হয়ে উঠতে চলেছে, সেই সংবাদ রাজা নিজেই পৌঁছে দেয়। অবশেষে রঞ্জন এসে পৌঁছয় যক্ষপুরীতে। মকররাজ চিনতে পারে না রঞ্জনকে হত্যা করে রাজা। যুবকের স্পর্ধিত আগমনকে ভয় করে রাজা ও তার সর্দারেরা তারা মানুষকে দাসে পরিণত করে রাখতে চায়। স্পর্ধাকে তাই ক্ষমা করে না। ভেঙে পড়ার আগে মকররাজ শেষ বারের জন্য নন্দিনীকে

ভয় দেখাতে চায়। নন্দিনী রাজার ঘরে এসে দেখতে পায় রঞ্জনের মৃতদেহ। আর-মকররাজের কাছে তখন ধরা পড়ে যায়, তার ক্ষমতার দম্ভ একটা বড় মিথ্যে। তাকে ঠকায় তার নিজের শাসনযন্ত্রই "ঠকিয়েছে। আমাকে ঠকিয়েছে এরা। সর্বনাশ! আমার নিজের যন্ত্র আমাকে মা নছে না।—" মকররাজ হাহাকার করে ওঠে যৌবনের প্রকাশকে নিজের হাতে হত্যা করার যন্ত্রণায়" আমি যৌবনকে মেরেছি—" এরপরই ধনতন্ত্রের অনিবার্য সেই অন্তর্ঘাত প্রকাশ্যে এসে যায়। রাজা নন্দিনীর সঙ্গে চলে যক্ষপুরীর কারাগারের দেওয়াল ভাঙতে "আজ থেকে আমাকে তোমার সাথি করো নন্দিন।.... এই আমার ধ্বজা, আমি ভেঙে ফেলি ওর দণ্ড, তুমি ছিঁড়ে ফেলো ওর কেতন। আমারই হাতের মধ্যে তোমার হাত এসে আমাকে মারুক, মারুক সম্পূর্ণ মারুক—তাতেই আমার মুক্তি।" নন্দিনী, ফাগুলালদের সঙ্গে রাজা লড়াইয়ে নামে পথে। রাজা সামিল হয় যৌবনের মিছিলে, জীবনের সন্ধানে। তারপরই বুঝতে পারে, এতদিন যক্ষপুরীর কারিগরদের মতই রাজা ও স্বয়ং বন্দি ছিল। ক্ষমতার সর্বোচ্চে নয়, ক্ষমতার শীর্ষবিন্দুতে পুতুলের মতো তাকে সাজিয়ে রাখা হয়েছিল। তাই রাজার সৈন্য, তার শাসন যন্ত্র, কিছুই রাজার আজ্ঞাবহ নয়, সেসব চলে সর্দারদের আদেশমতো। "ঐ যে দেখছি, সর্দার সৈন্য নিয়ে আসছে। এত শিগ্‌গির কী করে সম্ভব হল? আগে থাকতেই প্রস্তুত ছিল, কেবল আমিই জানতে পারিনি। ঠকিয়েছে আমাকে। আমারই শক্তি দিয়ে আমাকে বেঁধেছে।" রাজা নন্দিনীর ডাক শুনে নড়েচড়ে উঠেছিল। তারপরে সেই আহ্বান রাজার মর্মস্থলে পৌঁছে গেছে। যে ভণ্ডামিকে রাজা শক্তি বলে মনে করত, তার ফাঁকি নন্দিনীই রাজাকে ধরিয়ে দিয়েছে। রাজা তাই একদিন নিজেই পথে নেমে এসেছে জালের আড়াল ভেঙে। নন্দিনীই যে জীবনকে চিনতে শিখিয়েছে, মকররাজ যে সেই চেনাকেই জীবনের চরম বলে গ্রহণ করেছেন ফাগুলালের কথায় তা স্পষ্ট। অধ্যাপক তার পুঁথিপত্র ফেলে রাজার পথের পথিক হতে এলে ফাগুলাল তাই বলে, "রাজা তো ঐ গেল মরতে, সে নন্দিনীর ডাক শুনেছে।"

১.৭.৪ বিশু পাগল ঃ

'রক্তকরবী' নাটকে ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থায় শ্রমিক শোষণের রূপ নাট্যকার যে সচেতনভাবে তুলে ধরেছেন, তা আলোচিত হয়েছে। শ্রেণী বৈষম্যের কথা এই নাটকে রয়েছে। নন্দিনীর শ্রেণীগত অবস্থান যদিও শ্রমিকদের স্তরেই কিন্তু তাকে সংখ্যাতত্ত্বের ঘেরাটোপে নিষ্প্রাণ, নির্বোধ পুতুল করে দেওয়ার ক্ষমতা সর্দারদের নেই। অতএব নন্দিনী অনায়াসে রাজার কাছেও পৌঁছে যেতে পারে। যক্ষপুরীতে নন্দিনীর প্রধান সহচর বিশু। নন্দিনীর 'পাগল ভাই'। বিশুর সামাজিক অবস্থান সমগ্র নাট্যঘটনায় গোকুল, ফাগুলালদের সঙ্গে একই শ্রেণীতে, কিন্তু বিশুর কথাতেই জানা যায়, তার 'ডি-ক্লাসমেন্ট' হয়েছে। তাকে যক্ষপুরীতে আনা হয়েছিল চর হিসেবে। শ্রমিক অসন্তোষ তাদের সমস্ত খুঁটিনাটির খবর সর্দারদের কাছে পৌঁছে দেওয়াই ছিল তার কাজ। বিশুর স্বচ্ছ প্রাণ যে গানের সুরে ডুবে থাকে, সেই প্রাণ হাঁপিয়ে উঠেছিল এই কাজ। তাই সে নিজেই নেমে এসেছে ক-খ-ট-ঠ দের পাড়ায়। সেই অপরাধে তার স্ত্রী তাকে ছেড়ে চলে গেছে। বিশু তার অবস্থা সম্পর্কে সচেতন। সে জানে যক্ষরাজ এবং তাঁর সর্দারদের কড়া শাসনে মানুষেব প্রাণের রস শুকিয়ে যায়। "আমাদের না আছে আকাশ, না আছে অবকাশ—তাই বারো ঘণ্টার সমস্ত হাসি গান সূর্যের আলো কড়া করে চুঁইয়ে নিয়েছি এক চুমুকের তরল আগুনে। যেমন ঠাস দাসত্ব তেমনি নিবিড় ছুটি।" ফাগুলালের স্ত্রী চন্দ্রার হিসেবী মন বিশুর এই নির্বুদ্ধিতায় অবাক হয়। "এমন আরামের কাজেও টিকতে পারলে না বেয়াই?" কিন্তু বিশুর প্রাণের তার যে অন্যসুরে বাঁধা। মানুষকে যেখানে সংখ্যায় পরিণত করা হয়, তার কাছ থেকে প্রশ্নাতীত আনুগত্য দাবি করা হয়, সেই ব্যবস্থার অংশীদার বিশু হতে পারে না। যে মানুষগুলোর সবুজ গ্রাম ছিল, ফসল ফলানো ছিল, অভাব ছিল ঠিকই কিন্তু অবকাশও ছিল, নিজস্ব সংস্কৃতি ছিল। গাঁয়ের সেই মানুষগুলো যক্ষপুরীতে এসে 'দশ-পঁচিশের ছক' হয়েছে। তাদের কাজের যেমন সর্দারদের প্রখর দৃষ্টি, তাদের অবকাশেও ততটাই শ্যেন দৃষ্টি। বিশুর গান সেই যক্ষপুরীর দমবন্ধকরা গুমোটে প্রাণ পায় না। নন্দিনী সেখানে মুক্তির খবর এনেছে বলেই বিশুর সব বিষণ্ণতা

গানে গানে ভরে উঠেছে। নন্দিনী এবং বিশু পরস্পরের মধ্যে মুক্তির সন্ধান পায়।

নন্দিনী

পাগল ভাই, দূরের রাঙা দিয়ে আজ সকালে ওরা পৌষের গান গেয়ে মাঠে যাচ্ছিল শুনেছিলে?

বিশু

আমার সকাল কি তোর সকালের মতো যে গান শুনতে পাব? এ-যে ক্লান্ত রাত্তিরটাই ঝেঁটিয়ে-ফেলা উচ্ছিষ্ট।

নন্দিনী

আজ মনের খুশিতে ভাবলুম, এখানকার প্রাকারের উপর চড়ে ওদের গানে যোগ দেব। কোথাও পথ পেলুম না, তাই তোমার কাছে এসেছি।

বিশু

আমি তো প্রাকার নই।

নন্দিনী

তুমিই আমার প্রাকার। তোমার কাছে এসে উঁচুতে উঠে বাহিরকে দেখতে পাই।''

—অতএব বিশু এবং নন্দিনী পরস্পরের কাছে মুক্তির আশ্বাস বয়ে আনে। য(পুরীর অবরোধে বিশু ছটফটিয়ে মরছিল। নন্দিনীকে অবরুদ্ধ করার মতো আয়োজন যক্ষপুরীতেও নেই। নন্দিনী তাই বিশুর 'দুখজাগানিয়া', তার 'ঘুম-ভাঙানিয়া'। নন্দিনী বিশুর আয়নাও বটে। নন্দিনী যেমন বিশুর কাছে এলে 'উঁচুতে উঠে বাহিরকে' দেখতে পায়, বিশু ও তেমনি নন্দিনীর স্বচ্ছ দৃষ্টিতে দেখতে পায় নিজেকে। তার স্ত্রী চলে গেছে তাকে ছেড়ে। একটা জলজ্যান্ত মানুষ থেকে সে ৬৯ ঙ তে পরিণত হয়েছে। 'একজন সংবেদনশীল মানুষের আত্মবিশ্বাস হারানোর পক্ষে এ যথেষ্ট। বিশু ও তেমনি নিজেকে ভুলতে বসেছিল। অবশেষে নন্দিনীর চোখেই নতুন করে দেখতে পেয়েছে তার আলোকমুখ প্রাণের প্রতিবিম্ব। ''যক্ষপুরীতে ঢুকে অবধি এতকাল মনে হত, জীবন হতে আমার আকাশখানা হারিয়ে ফেলেছি। মনে হত, এখানকার টুকরো মানুষদের সঙ্গে আমাকে এক ঢেঁকিতে কূটে একাট পিণ্ড পাকিয়ে তুলেছে। তার মধ্যে ফাঁক নেই। এমন সময় তুমি এসে আমার মুখের দিকে এমন করে চাইলে, আমি বুঝতে পারলুম আমার মধ্যে এখনো আলো দেখা যাচ্ছে।'' নন্দিনীর সমস্ত খুশি, তার সব উচ্ছলতা, অন্তরের আগুন, রক্তকরবীর আভরণ সব-সব নিয়ে সে শুদুই রঞ্জনের। যৌবন প্লাবিত করে নন্দিনীকে। নন্দিনী সেই ভেসে যাওয়ার খবর বিশুকে অকপটে দেয়। রাজাকেও দেয়। তবুও বিশুর কাছ থেকে প্রাণের যে রসদ সে পায়, সেখানে রঞ্জন অনুপস্থিত। তার পাগল ভাইয়ের কাছে সেখানেই তার মনের অর্গল মুক্ত হয়ে যায়। তাদের খুশির আকাশে আলো ঝলমলিয়ে ওঠে যক্ষপুরীর অন্ধকারকে আরও ম্লান করে দিয়ে। ''তোমাকে একটা কথা বলি পাগল। যে দুঃখটির গান তুমি গাও আগে আমি তার খবর পাইনি।'' বিশু ও নন্দিনীকেই তাই জানাতে পারে তার যন্ত্রণার কথা। কেমন করে একটি মেয়ে সর্দারের সোনার চূড়া দেখে পাগল হয়েছিল আর বিশুকেও টেনে এনেছিল সেই স্বর্ণচূড়ার আকর্ষণে। যেখান থেকে যক্ষপুরীর বন্দি জীবনে হাহাকার করে উঠেছে বিশুর সুর। একটি মেয়ে সোনার স্বপ্ন দেখিয়ে বিশুকে বন্দীজীবনে টেনে এনেছিল, আর নন্দিনী স্বপ্ন দেখায় মুক্তির। বিশুর কাছেই নন্দিনী মকররাজের কথা বলে। আসলে নন্দিনীর সঙ্গে তার পাগলভাইয়ের সম্পর্ক দুঃখের, মুক্তির আকাঙ্খায় অধীর হয়ে ওঠার মধ্যে। সেই সম্পর্ককে বুঝতে ফাগুলাল, চন্দ্রারা তাই ভুল করে, ভুল করে সর্দারও। নন্দিনীর সঙ্গে বিশুকে প্রাণের আলাপ করতে দেখে বিশুকে সর্দার প্রশ্ন করে ''কী গো ৬৯ঙ, সকলেরই সঙ্গে তোমার প্রণয়, বাছ-বিচার নেই?'' নন্দিনীর সঙ্গে তার পাগলভাইয়ের সম্পর্কের শুরু যক্ষপুরীতে এসে নয়,

তাদের গাঁয়েই। সেখানে রঞ্জন-নন্দিনীর দুরন্তপনায় বিশুও যে সাথি ছিল, নন্দিনীর কথায়, তার আঁচ পাওয়া যায়। তারপর একদিন 'মনে কী দ্বিধা রেখে' চলে এসেছিল বিশু। নন্দিনীর মনে 'যেতে যেতে তুয়ার হতে' কী ভেবে মুখখানি ফিরিয়ে চেয়ে আসার একটা ছোট্ট বেদনায় রয়ে গিয়েছিল। অতএব নন্দিনী বা রঞ্জনের মতই বিশুও আলোকমুখী প্রাণ। নন্দিনী যেমন করে যক্ষপুরীর নিয়মের জাল ছিঁড়ে খুঁড়ে দিতে পারে, বিশু ও পারে সর্দারের মুখের ওপর বলে দিতে, "তোমাদের দুর্গ থেকে কী করে বেরিয়ে আসা যায় পরামর্শ করছি।" শাস্তির ভয়, মৃত্যুর ভয় সমস্তই অনায়াসে তুচ্ছ করতে পারে নন্দিনীর পাগলভাই। কিশোরের মতই। নন্দিনী-সর্দারকে কুন্দফুলের মালা উপহার দিলে তাই বিশুর স্পর্ধিত উচ্চারণ সর্দারের সামনেই "ছি ছি, মালাটা নষ্ট করলে! রঞ্জনের জন্যে রাখলে না কেন?" বিশুর সঙ্গে নন্দিনীর যোগাযোগ নিবিড় ভালবাসায় বাঁধা, রাজার কাছেও তা ধরা পড়ে যায়। নন্দিনীকে ভালবাসে তার পাগলভাই। অথচ নন্দিনীর ভালবাসার জন্যও তার অগাধ ভালবাসা। রঞ্জনের কথা উঠলে বিশুরও কথার বান ডেকে যায়। তার প্রাণের কাছাকাছি যে নারী, তার প্রিয়তম পুরুষটিও বিশুর ভালবাসার পাত্র। রঞ্জনের শ্রেষ্ঠত্বকে স্বীকার করে নিতেও কোথাও কুণ্ঠা নেই তার। রাজার কাছে তাই নন্দিনী যেমন অকপটে স্বীকার করে নেয় বিশু তার সাথের সাথি, বিশুও সমস্ত সম্পর্ককে স্বীকার করে নিয়ে রাজাকে স্পষ্টই জানায় "না রাজা, আমি রঞ্জনের ও-পিঠ, যে পিঠে আলো পড়ে না—আমি অমাবস্যা"। বিশুর গানও নন্দিনীর মতই যক্ষপুরীর শোষণযন্ত্রকে ভেঙে চুরমার করে দিতে পারে। বিশু পাগলের গান শুধুই নন্দিনীকে ভাসিয়ে নিয়ে যায় আর সর্দারদের ভয় পাইয়ে দেয়। ভয় পাওয়ায় রাজাকেও। আসলে শ্রমিক শোষণের নিয়ম এতই ফাঁকা যে সর্দাররা এবং রাজাও ভয়ে ভয়ে থাকে। তাদের ভয় নন্দিনী-রঞ্জন-বিশু-কিশোরদের। রাজা জানে, মানবহৃদয়ের অবশ্যম্ভাবী মনুষ্যত্ববোধ লোহার কপাট দিয়ে আটকানো। সেই লৌহকপাটে নন্দিনী ঘা দেয় বলেই রাজার নিয়ম এলোমেলো হয়ে যায়। বিশু নন্দিকীকে গান শিখিয়েছে 'ভালবাসি ভালবাসি' আর সে গান শুনে রাজা চিৎকার করে ওঠে "থাক্ থাক্ থামো তুমি, আর গেয়ো না"। বিশুর কাছে সেই ফাঁকি ধরা পড়ে যায়। সামান্য খোদাইকরের দলের হয়েও তাই রাজার সম্পর্কে যেন করুণা প্রকাশ পায় পাগলভাইয়ের কথায় "ওর বুকের মধ্যে যে বুড়ো ব্যাঙটা সকল রকম সুরের ছোয়াচ বাঁচিয়ে আছে, গান শুনলে তার মরতে ইচ্ছে করে। তাই ওর ভয় লাগে—" নন্দিনীকে সঙ্গে করে তাই বিশু যেন যক্ষপুরীর হাওয়ায় তার গানের মধ্যে দিয়ে বিদ্রোহের আগুন ছড়িয়ে দেয়, ভয় পাইয়ে দেয় মকররাজ আর তার সর্দারদের। বিশুর মধ্যে যে বিদ্রোহের আগুন থেকে স্ফুলিঙ্গ ছড়ায় যক্ষপুরীর বাতাসে, তার শাস্তি পেতেই হয় তাকে। রঞ্জনকে চিনিয়ে দেবার জন্য ডাক পড়ে তার। পাগল ভাইয়ের প্রাণের সখী নন্দিনীর প্রিয়তম রঞ্জন যক্ষপুরীর শোষণযন্ত্রকে ভেঙে নিশ্চিহ্ন করে দিতে পারে, এই বিশ্বাস যার শ্বাসপ্রশ্বাসে, স্বভাবতই সে সর্দারদের রক্তচোখকে ভয় করবে না। ফলস্বরূপ বিশুর কপালে অমানবিক অত্যাচার জোটে, তাকে বিচারশালায় নিয়ে যাওয়া হয়। রক্তাক্ত সেই মানুষটি নন্দিনীকে গান শোনাতে শোনাতে বিদায় নেয় প্রহরীর বাঁধনের যন্ত্রণা নিয়ে। যক্ষপুরীতে যেখানে ফসলের আভাস নেই, মাটির মরা ধন তুলতে তুলতে যাদের মনুষ্যত্বও মরে গেছে, তাদের শুনিয়ে যায় ফসল কাটার গান। প্রিয় মানবীর জন্য উচ্চারণ করে যায় শুভেচ্ছা, "এইবার রঞ্জনের সঙ্গে তোমার মিলন হোক।"

নাটকের একেবারে শেষ দৃশ্যে বিশু আসে বিদ্রোহের স্পষ্ট খবর নিয়ে। বিদ্রোহের রঙ যে রমনী তাকে স্পষ্ট করে চিনিয়েছিল, সেই নন্দিনীকেই দিতে আসে বিদ্রোহের সংবাদ, তাকে সাথি করতে চায়। "আমাদের কারিগররা বন্দি শালা ভেঙে ফেলেছে। তারা ঐ চলেছে লড়তে। আমি নন্দিনীকে খুঁজতে এলুম। সে কোথায়?" রঞ্জনের রক্তাক্ত দেহ পড়ে থাকতে দেখে সে পথের ধুলোয়। বুঝতে পারে, যে নন্দিনী তার প্রাণে সুর জোগাতো, তাকে বিদ্রোহের শক্তি জোগাত, সে চলে গেছে তার রক্তকরবীর উন্মাদনা যক্ষপুরীর প্রাণে জাগিয়ে দিয়ে। নন্দিনীর পাগলভাই উপলব্ধি করে, তার একলা লড়াইয়ের শুরু। তার পাগলি তাকে যক্ষপুরীর বন্দিশালা ভাঙবার ভার দিয়ে গেছে। কৃষিজীবী

মানুষগুলোকে সেখান দিয়েই নিয়ে যেতে হবে সবুজের কাছে। ফিরিয়ে দিতে হবে তাদের সংস্কৃতি। সেসব উপলব্ধি করেই বিশুর শ্লোগান "নন্দিনীর জয়"।

১.৭.৫. কিশোর ঃ

'রক্তকরবী' নাটকের প্রাণশক্তি নন্দিনী। নন্দিনী যক্ষপুরীর অন্ধকারে দেয়ালের ফাঁক দিয়ে আসা একফালি রোদের মতো। যেখানে মনুষ্যত্ব লাঞ্ছিত হয় প্রতি মুহূর্তে, সেখানে নন্দিনী নিজেই একটা প্রতিবাদের নাম। নন্দিনী খুশির হাওয়া বইয়ে দিয়েছে কিশোরের প্রাণে, বিশু পাগলার প্রাণে, অধ্যাপকের তাত্ত্বিক জীবনে এমনকি রাজাকেও সে কাজ ভুলিয়েছে। নন্দিনীকে অস্বীকার করাও যায় না। নন্দিনীকে রক্তকরবীর ফুল এনে দিতে গিয়ে কিশোর তাই মার খায়। মার খেয়েও ধন্য হয়ে ওঠে। অথচ কিশোর তো নন্দিনীর সঙ্গে চেনাজানা সামাজিকতার কোন নিয়মে বাঁধা নয়। নন্দিনীর প্রণয়ীও নয় সে। তবুও এতটাই সম্পর্কিত যে নন্দিনীর জন্যে প্রাণ দিতেও পারে। "একদিন তোর জন্যে প্রাণ দেব নন্দিনী, এই কথা কতবার মনে মনে ভাবি।" আসলে নন্দিনীর সঙ্গে কিশোরের যোগ অন্য জায়গায়। যেখানে মানবের লাঞ্ছনার বিরুদ্ধে সোচ্চার হতে মানুষ ভয় পায় না। কিশোরও তো ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থায় শোষণ এবং অত্যাচার সম্পর্কে ওয়াকিবহাল এবং তার প্রতিস্পর্ধী হওয়ার সাহস তার আছে। নন্দিনী মানবীসুলভ বন্ধুত্ব আর দুর্বলতা নিয়ে কিশোরকে 'একটু সামলে' চলার পরামর্শ দিলে কিশোর তাই বলে ওঠে, "না, আমি সামলে চলব না, চলব না। ওদের মারের মুখের উপর দিয়েই রোজ তোমাকে ফুল এনে দেবে।" এখানেই কিশোর, বিশু, রঞ্জন, নন্দিনী সবাই একাকার হয়ে যায়। এক হয়ে যায় তাদের স্বপ্ন দেখা। একদিন একটা পৃথিবী আসবে যেদিন কিশোর নন্দিনীকে ফুল এনে দিতে গেলে তাকে অত্যাচার সইতে হবে না। তারা একই স্বপ্ন দেখতে পারে বলেই কিশোরের সঙ্গে নন্দিনীর প্রাণের যোগ।

১.৭.৬ অন্যান্য চরিত্র

'রক্তকরবী' নাটকের মূল চরিত্র নন্দিনী, বিশু, রঞ্জন এবং মকররাজ। এই নাটকের পটভূমি যক্ষপুরী। যক্ষপুরীতে কাজ করতে আসা খোদাইকররা এখানে এসে সংখ্যায় পরিণত হয়েছে। ফাগুলাল, গোকুল এমনই চরিত্র। জীবনকে খুব সাধারণভাবে দেখে তারা। যক্ষপুরীতে সোনার টানে তারা এসেছে। সেদিন যে ঐশ্বর্য তাদের চোখ ধাঁধিয়ে দিয়েছিল, সেটা যে আসলে বন্দিশালা, সেখান থেকে যে আর 'ফিরিবার পথ নাহি', সেকথা তারা বুঝতে পারেনি। কিন্তু এই বন্ধনদশাকে ভবিতব্য বলেই মেনে নিয়েছিল তারা যতদিন যক্ষপুরীতে নন্দিনী আসেনি। সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থায় প্রজা শোষণ হয় কিন্তু প্রভুর কাজ শেষ করে বাড়িতে ফিরে শ্রমিকরা যাত্রার আসর বসাবে, না গান গাইবে নাচ করবে, সেখানে সামন্তপ্রভু হস্তক্ষেপ করেন না। ফলে সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থায় লোকসংস্কৃতি সৃষ্টি হয় চর্চিত হয় লোক সাধারণের নিজস্ব নিয়মে। ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থায় কিন্তু লোকসাধারণের সংস্কৃতি বন্ধ্যা হয়ে যায়। কেননা সেখানে ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থা ও অর্থনীতির চালিকাশক্তি যাদের হাতে, সেই সর্দারেরা চর রাখে, গোঁসাই রাখে শ্রমিক অসন্তোষ দমন করবার জন্য। শুধু তাই নয়, সেখানে সুপ্রচুর মদ বরাদ্দ থাকে বিশু, ফাগুলালদের জন্য। ফাগুলাল মদের মধ্যে ডুবে থেকে তার যন্ত্রণাকে ভুলতে চায়। তার শেকড় ছিঁড়ে যাওয়ার যন্ত্রণা, সংখ্যায় পরিণত হওয়ার যন্ত্রণা। কেনারাম গোঁসাইকে তাই ভালো কথা শুনিয়ে ফাগুলালদের মন শান্ত করার কথা বললে ফাগুলালের ভেতরকার সেই চাপা দেওয়া বিদ্রোহের বহিঃপ্রকাশ ঘটে "নানা, সে হবে না সর্দারজি! এখন সন্ধেবেলায় মদ খেয়ে বড়োজোর মাতলামি করি, উপদেশ শোনাতে এলে নরহত্যা ঘটবে।" গোঁসাইয়ের শান্তিমন্ত্রে চন্দ্রা বিগলিত হলে ফাগুলাল কিন্তু বলে "এতক্ষণ অবিচলিত ছিলুম, কিন্তু আর তো পারিনে। সর্দার, এত বড়ো অপব্যয় কিসের জন্যে? প্রণামি আদায় করতে চাও রাজি আছি, কিন্তু ভণ্ডামি সইব না।" ফাগুলালের মধ্যে দাসত্ব স্বীকার করে নেবার মধ্যেও যে খুব সংগোপনে বিদ্রোহের বীজ সুপ্ত ছিল, তার প্রমাণ তার পথে নামার মধ্যে। নাটকের শেষে নন্দিনী, বিশুর সঙ্গে বন্দিশালার দরজা

ভাঙতে বিপ্-বের নিশান তুলে ধরেছে ফাগুলালই। সেই তুলনায় চন্দ্রা অনেকবেশি আপোস করতে অভ্যস্ত। সে সর্দারের ওপর ভরসা করে, ছুটির জন্য দরবার করে। নন্দিনীর প্রতি একটা সূক্ষ্ম ঈর্ষা যেমন চন্দ্রার মধ্যে আছে, তেমনি চন্দ্রা সত্যিই বি(াস করে, একদিন নন্দিনী য(পুরীর সর্বনাশ ঘটবে। আসলে চন্দ্রা আর পাঁচটা গড়পরতা মেয়ের মতই মোটা ভাত-কাপড়ের আরামটুকু হারাতে চায় না। তাই বিশুর 'ডি ক্লাসমেন্ট' তার কাছে আ(পের বিষয়।

য(পুরীর সর্দারেরা আসলে রাজাকেও বন্দি করে রাখে। সর্দাররাই আসলে চালিকাশক্তি(হাতে নিয়ে শ্রমিক শোষণের ছক কষে। মুখে তাদের অমায়িক হাসি। চন্দ্রাদের সম্পর্কিত করার মতো উদারতাও দেখায়। মোড়লদের সম্পর্কে যেমন, গোঁসাই সম্পর্কেও তেমন একটা দেখনসই উদারতার মুখোশ পরে থাকে। কিন্তু নন্দিনীতো সর্দারকেও কুঁদফুলের মালা উপহার দেয়। সর্দারের সঙ্গে মেজো সর্দারের একটা মানবসুলভ পার্থক্য এবং দ্বন্দ্ব রয়েছে। মেজো সর্দার আবার রাজার প্রতি বি(স্ত থাকতে চায়। কিন্তু সর্দার জানায়, 'রাজাকে ঠকাতে হয়, রাজাকে ঠেকাতেও হয়।'' নন্দিনীকে সামনে রেখে সর্দারের সঙ্গে মেজো সর্দারের যে দ্বন্দ্ব, তার দ্বারা প্রমাণ হয়ে যায়, একটা ঘোর অবি(াসের বাতাবরণ য(পুরীকে ঘিরে রয়েছে। রাজা, সর্দার, মেজো সর্দার—সকলেই সকলের অবি(াসের পাত্র।

'রক্ত(করবী' নাটকে দুটি ইন্টেলেকচুয়াল চরিত্রকে রূপায়িত করেছেন রবীন্দ্রনাথ(অধ্যাপক এব পুরাণবাগীশ। সংলাপের প্রে(তে বোঝা যায় যে, প্রতম জন হলেন বিজ্ঞানী (তথা বাস্তুবাগীশ) এবং দ্বিতীয় ইতিহাস, দর্শন, পুরাণ ইত্যাদির পণ্ডিত। পুরাণবাগীশের গুরুত্ব এ নাটকে নেই বললেই চলে, যা পা(চরিতর হওয়া সত্ত্বেও অধ্যাপক সম্পর্কে বলা যাবে না। এই মানুষটিকে টিপিক্যাল মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবীর প্রতিভূরূপে গড়েছেন কবি। তাঁর আবেগ খনিশ্রমিকের প্রতি আছে বটে, কিন্তু সতর্ক স্বার্থবুদ্ধি। তাকে মালিপ(র সঙ্গেই থাকতে বাধ্য করে। য(পুরীর আর সব পু(ষের মতোই নন্দিনীর সম্পর্কে তাঁরও একটা অনির্দেশ্য আকর্ষণ আছে, কিন্তু সে কখনও গোঁসাইয়ের মতন তার সম্বন্ধে অর্ধস্ফুট লোলুপতা দেখায় না, বা সর্দারের মতো বিরূপতার মোড়কে আকাঙ্খাকে ঢেকে রাখে না। অধ্যাপক নাটকের শেষ পর্বে একটা গু(ত্বপূর্ণ অবস্থানে চলে এসেছেন। গণবিপ্-বের অগ্রনায়িকা হয়ে নন্দিনী যখন ছুটে গেছে বন্দিশালা ভাঙার নেতৃত্ব দিতে, তার পিছনে ছুটে গেছে য(পুরীর শ্রমিকের দল, আশেপাশের গাঁয়ের কৃষকেরা(আর এই মধ্যবিত্ত-বুদ্ধিজীবী অধ্যাপকও সামিল হয়েছে সেই মিছিলে। শ্রমিক-কৃষকের সঙ্গে মধ্যবিত্ত-বুদ্ধিজীবী শ্রেণীর মানুষও না-এলে যে যথা অর্থে জনগণতান্ত্রিক বিপ্-ব সাফল্য লাভ করে না, ইতিহাসে সেই সত্য বারংবার প্রমাণিত হয়েছে। এখানে য(পুরীর ধনতান্ত্রিক শোষণকে মোকাবিলা করতে শ্রমিক-কৃষকের পাশাপাসি মদ্যবিত্ত শ্রেণীর বুদ্ধিজীবী অংশ যদি যোগ না দেয়, তাহলে বিপ্-বের পরিপূর্ণ বিস্ফোরণ যে ঘটতে পারে না, রবীন্দ্রনাথ সেটা উপলব্ধি করেচেন। তার সেই পরিপূর্ণতা সাধনের জন্যই তিনি অধ্যাপককেও নিয়ে গেছেন ''কারার ঐ লৌহকপাট'' ভাঙার সংগ্রামে। ফরাসি বিপ্-বে বাস্তিলের কারাগার ভাঙা কিংবা রুশ বিপ্-বে জারে উইন্টার প্যালেস অধিকার করার লড়াইতেও এই তিন সামাজিক শ্রেণীরই প্রতিনিধিত্ব ছিল কমবেশি, সেকথা এখানে মনে রাখতে হবে।

'রক্ত(করবী'র পা(চরিত্রগুলির সামগ্রিক মূল্যায়নে এটাই দেখি যে, এরা য(পুরীর সামাজিক বিন্যাসে একে অন্যের সঙ্গে বিচিত্র কিছু দ্বান্দ্বিক সম্পর্ক আবদ্ধ হয়ে আছে। ফাগুলাল, গোকুল, চন্দ্রা এরা ঐ য(নগরীর শ্রমজীবী নারীপু(ষদের প্রতিভূ বা প্রতিনিধি। বড়-মেজো-ছোট তিন সর্দার, মোড়ল, গোঁসাই—এরা য(পুরীর শাসনব্যবস্থার যে নির্মম যন্ত্ররূপ, তারই ছোট-বড় সব স্(-নাট-বল্টু-হ্যান্ডেল-লেভার স্বরূপ। কিন্তু, বস্তুতপ(এরা তো কেউই যন্ত্র নয়, মানুষ—তাই মানবীয় প্রবৃত্তি, প্রবণতা সবই এদের মধ্যে আছে। মেজো সর্দার তাই য(নগরীর শাসক-শোষকের দলভুক্ত(হয়েও সেই ব্যবস্তাকে ঘৃণা করে। গোঁসাই নিজেও জানে সে মিথ্যাচারী। এমন কী বড় সর্দারও দ্বিধায় ভোগে। চর ব্যবস্থা নির্ভর, এক্সপ-য়টেশন-সর্বস্ব সামাজিক পরিকাঠামো যে ভঙ্গুর—তা এদের পারস্পরিক অবি(াস এবং সংশয় থেকেই বোঝা যায়। তাই কাহিনীর শেষে যখন ধনতন্ত্রের সহজাত স্ব-বিরোধের লব্ধফল হিসেবে রাজা এবং তাঁর (অচিরপূর্ব পর্যন্ত অনুগত) সর্দার বাহিনীর মধ্যে সঙঘাত অনিবার্য হয়ে উঠেছে দেখা যায়,

তখন এই সব পার্শ্বচরিত্রগুলি ইতিহাসের কুশীলব হয়ে শেষ সংগ্রামের এপ(-ওপ(সামিল হয়, দেখি। 'রক্ত(করবী' নাটকেই সেইটাই হল এই চরিত্রগুলির সবচেয়ে বেশি গু(ত্ব।

1.8 অনুশীলনী :

1.8.1 বিস্তৃত প্রশ্ন ঃ

১। 'রক্ত(করবী' নাটকের নামকরণ কতটা যুক্তি(যুক্ত(অলোচনা ক(ন। প্রসঙ্গত্র(মে, এর আগের নামদুটি—'য(পুরী' এবং 'নন্দিনী' রাতখানি মানান্সই ছিল তাও বলুন।

২। 'রক্ত(করবী' নাটকে শ্রেণী-বৈষম্যের যে ছবি আছে, নাটক অবলম্বনে তা আলোচনা ক(ন। এ নাটক কি সত্যিই শ্রেণিসংগ্রামজাত গণবিপ্-বের চিত্রায়ন করেছে? আলোচনা ক(ন।

৩। ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থায় (মতার চুড়ায় বসে ছিলেন যে মকররাজ, তিনিই একদিন পথে নেমেছেন শ্রমজীবী মানুষের সঙ্গে—রাজার এই পরিবর্তনকে ব্যাখ্যা ক(ন।

৪। ''নন্দিনীই রক্ত(করবী নাটকের প্রাণশক্তি(''—আলোচনা ক(ন। নন্দিনী-রঞ্জনের প্রেম এ নাটকে কতখানি সঞ্জীবনী— প্রসঙ্গত্র(মে তা-ও বলুন।

৫। বিশুপাগল চরিত্রটি এই নাটকের (ে ত্রে কতটা গু(ত্বপূর্ণ। নাটক অবলম্বনে আলোচনা ক(ন।

৬। 'রক্ত(করবী' নাটকে সংকেত এবং প্রতীকের ব্যবহারগুলি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ—এই বক্ত(ব্যের আলোচনা প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাটকে প্রতীক ব্যবহারের তাৎপর্য লিখুন।

৭। ''রক্ত(করবী নাটকের গানগুলিও এক অর্থে যেন প্রতিবাদেরই অস্ত্র''—এই কথার যাথার্থ্য আলোচনা ক(ন।

৮। কিশোর চরিত্রটি এই নাটকে কতটা অনিবার্য বলে আপনার মনে হয়?— যুক্তি(সহ আলোচনা ক(ন।

৯। রক্ত(করবী ফুল এই নাটকে কীভাবে এসেছে? এর সাংকেতিক বি(ে-ষণ ক(ন।

১০। এই নাটকের অপ্রধান চরিত্রগুলির গুরুত্ব আলোচনা ক(ন। নাটকের কোন্ কোন্ প্রয়োজন তাদের দ্বারা সাধিত হয়েচে তাও দেখান।

১১। ''রঞ্জন এই নাটকের শু(থেকে শেষ পর্যন্ত উপস্থিত''—আলোচনা ক(ন। রঞ্জন-বিশ-রাজা সর্বত্র তাদের পারস্পরিক সম্পর্কগত অবস্থান সম্পর্কেও আলোকপাত ক(ন।

১২। ''সত্যি কথা বলি, দাদা, নন্দিনীকে যখন দেখি নিজের দিকে তাকিয়ে লজ্জা করে।''—কার উক্তি(? উক্তি(র তাৎপর্য বি(ে-ষণ ক(ন।

১৩। ''মকরের দাঁত, খাঁজে খাঁজে বড়ো পরিপাটি করে কামড়ে ধরে।''— কার সম্পর্কে, কোন্ প্রসঙ্গে, কার এই উক্তি(?

১৪। ''ও আসবে বলে অপে(া করে ছিলুম, ও তো এল। ও আবার আসার জন্যে প্রস্তুত হবে, ও আবার আসবে। —'' এই কথার বিস্তৃত ব্যাখা ক(ন।

১৫। ''সবার আগে ঐ ডাইনিকে পুড়িয়ে মারতে হবে''— কার সম্পর্কে কার এই উচ্চারণ? এই ভুল কেমন করে ভেঙেছে? নাটকের পরিণামে সেই ভুল ভাঙার অভিঘাত কতখানি পড়েছে— দেখান।

১৬। ''রঞ্জনের মৃত্যুর মধ্যে দিয়েই তার জয়ের সূচনা—আলোচনা ক(ন।

18.2 অবিস্কৃত প্রশ্ন ঃ

১। 'রক্ত(করবী' নাটক রবীন্দ্রনাথ খসড়া হিসেবে কতবার লেখেন? বিভিন্ন পাঠের মধ্যে উল্লেখযোগ্য পার্থক্যগুলি কী কী নির্দেশ ক(ন।

২। ''নাটকটি সত্যমূলক''। 'রক্ত(করবী' সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের নিজেরই এই উক্তি(র তাৎপর্য আলোচনা ক(ন।
৩। 'মরা ব্যাঙ' এবং 'নীলকণ্ঠপাখির পালক', 'রক্ত(করবী' নাটকে কোন্-কোন্ ব্যঞ্জনা সৃষ্টি করেছে? বলুন।
৪। 'রক্ত(করবী' নাটকে একটি 'অশ্রুত' গানে প্রসঙ্গ আছে(সেটি কখন, কার গাওয়া?
৫। 'দুখ জাগানিয়া' এবং 'ঘুম ভাঙানিয়া' কথাদুটির তাৎপর্য কী বলুন।
৬। রক্ত(করবী এব কুন্দ—এই দুটি ফুল 'রক্ত(করবী' নাটকে কী কী ভাবের ব্যঞ্জনা সঞ্চার করেছে, বলুন।
৭। অধ্যাপক এবং গোঁসাই—এই দুজন 'রক্ত(করবী' নাটকের কোন্-কোন্ উদ্দেশ্যসাধন করেছে, বলুন।
৮। 'পৌষের গান'টির গুরুত্ব এ-নাটকে কতখানি বলুন।

18.3 সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন ঃ

১। নন্দিনী কোন্ গাঁয়ের মেয়ে?
২। নন্দিনীর ছোটবেলার সাথিদের নাম কী-কী?
৩। য(পুরীতে ফাগুলাল নাটকের কোন্ খসড়ায় দেওয়া হয়?
৪। 'নন্দিনী' নামকরণ নাটকের কোন্ খসড়ায় দেওয়া হয়?
৫। 'রক্ত(করবী' নাটকের পরো(প্রেরণা হিসেবে মান-ইতিহাসের কোন্ দুটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাকে নির্দেশ করা যায়?
৬। লালটুপি পরা লোকেরা রঞ্জনকে কার বাড়িয়ে দেখেছিল?
৭। মার খাওয়ার পর পালোয়ানের বাসা স্থির হয়েছিল কোথায়?
৮। পাহাড়তলার সরোবরে কোথা থেকে জল এসে জমা হত?
৯। ''দুর্গম দূর্গের লোহার অর্গল''—কীসের উপমা?
১০। বিশুর বউকে কারা, কেন নিমন্ত্রণ করত?
১১। ''নিবিড় যৌবনের ছায়াবীথিকায় নবীনের মায়ামৃগী'' মানে কী?
১২। ''রাজার এঁটো'' কারা?
১৩। ''ধ্বজদন্ত' সম্পর্কে য(পুরীর মানুষের ধারণা কী?
১৪। বজ্রগড়ে কী হত? কুবেরগড় কোথায়?
১৫। ''এবার আমার সময় এল একলা মহাযাত্রার''— কার কথা?
১৬। ৩২১ য(পুরীতে কোন্ ব্যক্তি(র সংকেতসংখ্যা?
১৭। অধ্যাপক ''প্রলয়গোধূলির মেঘ'' বলে কীসের উল্লেখ করেছিলেন?

18.4 গ্রন্থপঞ্জি ঃ

১. রক্ত(করবী □ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (বি(ভারতী, ২০০২)
২. 'রক্ত(করবী' □ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (ন্যাশনাল বুক এজেন্সি সংস্করণ □ সম্পাদনা □ পল্লব সেনগুপ্ত, ২০০১)
৩. 'রক্ত(করবী' □ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (পাণ্ডুলিপি-সংবলিত সংস্করণ, বি(ভারতী □ সম্পাদনা □ প্রণয়কুমার কুণ্ডু(১৯৯৮)
৪. 'রক্ত(করবী' লোকায়ত ভাবনা □ দীনেন্দ্রকুমার সরকার (পুস্তক বিপণি(১৯৮৩)
৫. রবীন্দ্রনাথের রক্ত(করবী (সমাজ-বাস্তবতা □ অজয়কুমার ঘোষ (ভাষা ও সাহিত্য, ১৯৯৪)
৬. 'রক্ত(করবী' অন্যভাবনায় □ সৌমিত্র বসু (রত্নাবলী, ২০০০)